ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ।। ১৩ ভাদ্র ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ৩০ আগস্ট, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

পরলোকে বংশীলাল সোনী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক বংশীলাল সোনী আর নেই। গত ২০ আগস্ট রাত্রি ১০-১৫ মিনিটে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। গত কয়েকদিন ধরে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেও মনে হয়নি যে তিনি আর কয়েক ঘন্টা মাত্র আমাদের মধ্যে আছেন। কিন্তু গুরুতর 'হার্ট অ্যাটাক'-এর ফলে তাঁর জীবন দীপ অকস্মাৎ নিভে যায়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর। পরের দিন সকালে কেশব ভবনে স্বয়ংসেবকেরা তাঁকে অন্তিম প্রণাম জানান। কলকাতা নিমতলা শ্মশান ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ১৯৫০ থেকে ২০১০— এই দীর্ঘ ষাট বছর প্রচারক জীবনে সঙ্ঘ তথা বিজেপির সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তিনি যে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে গেছেন তা বহুদিন স্মরণে থাকবে। বিশেষত মালদা তথা উত্তরবঙ্গের

(এরপর ৪ পাতা)

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে মাইনে বেশি সাংসদদের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'মাইনে' বৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট নন দেশের সাংসদদের একাংশ। তবে 'ওয়াকিবহাল' মহল মনে করছে-এর পেছনে অর্থনৈতিক কারণ যতটা না রয়েছে, তার থেকে বেশি রয়েছে 'ইগো সমস্যা'। কারণ মন্ত্রীদের অধস্তন সচিবদের বেতন প্রায় ৮০,০০০ টাকার মতো। স্রেফ এই কারণেই মন্ত্রীদের বেতন এদের থেকে ন্যূনতম ১ টাকা বাড়িয়ে অন্তত ৮০,০০১ টাকা করার দাবি তুলেছিল লালু-মুলায়মরা। এমনকী যৌথ সংসদীয় কমিটিও সাংসদদের মূল বেতন অন্তত ৮০,০০০ টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের অগ্নি-মূল্য ও দেশে সাম্প্রতিক বন্যা ও খরা পরিস্থিতি নিয়ে গণঅসন্তোষের কথা মাথায় রেখেই সরকার গত ২১ আগস্ট বেতন-বৃদ্ধি করে সাংসদদের। মাসিক ১৬ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয় তাঁদের বেতন। কিন্তু এতেও ইউপিএ সরকারের একদা 'বন্ধু' লালু-মুলায়মরা খুশি না হওয়ায় তাদের সন্তুষ্ট করতে, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সাংসদদের বেতন ও ভাতা আরও ১০ হাজার টাকা বাড়িয়ে দেয় সরকার। কিন্তু এ নিয়ে সরাসরি আপত্তি রয়েছে সরকারেরই শরিক তৃণমূলসহ সংসদেরই একাংশের। আপত্তি জানিয়েছে বিজেপি-ও।

লালু-মুলায়মেরা যতই নিজেদের বেতনকে সচিব পর্যায়ের বেতনের সঙ্গে তুলনীয় করে দেখাতে চান না কেন, তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন এরকম অসম তুলনা একেবারেই চলে না। কারণ সাংসদরা বেতন ছাড়াও পান তাঁদের দফতরের খরচ, নির্বাচন কেন্দ্র ভাতা, দৈনিক ভাতা (গড়ে বছরে ১৮০ দিন হিসেবে), টেলিফোন (ল্যান্ড লাইন ও মোবাইল)-এর খরচ, ব্রডব্যান্ডের খরচ, ৫০,০০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ-ভাতা। এছাড়া সাংসদদের বিমান ও রেল পরিবহনের খরচাও দেয় সরকার। তার ওপরে প্রথম কিংবা দ্বিতীয়বারের সাংসদরা দিল্লীর নর্থ বা সাউথ অ্যাভিনিউ কিংবা তিন বারের বেশি মেয়াদের সাংসদরা দিল্লীর পশ এলাকায় বাংলো পান। তার আর্থিক-মূল্যও নেহাত কম নয়। সর্বোপরি বছরে ৪০০০ কিলোমিটার জল বিনামূল্যে, একটি ল্যাপটপ ও পামটপ, গাড়িতে ঘোরাঘুরির খরচ কিলোমিটার প্রতি ১৬ টাকা এবং গাড়ি কিনতে বিনা সুদে চার লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পান তাঁরা। সাংসদদের বেতন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক সব কিছুরই খরচ ও ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত তাঁদের বার্ষিক 'নীট' মুনাফার পরিমাণ যদি ৪২ লক্ষ টাকা হয়ে থাকে, তবে এবার তা ৫৭ লক্ষ টাকার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, সাংসদদের এই বিপুল রোজগারের প্রায় সব টাকাটাই 'কর মুক্ত'। কেবলমাত্র এতদিন তাঁদের বার্ষিক রোজগারের ১,৯২,০০০ টাকার (১৬,০০০ ×১২ মাস) ওপর কেন্দ্রীয় কর-কাঠামো অনুযায়ী মাত্র ৩,২০০ টাকা কর দিতে হোত। অথচ মাথা পিছু একজন সাংসদের রোজগার প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা। সাংসদদের এবার মাইনে বেড়ে ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা (৬০,০০০×১২) হলেও অন্যান্য ভাতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁদের সর্বমোট রোজগার প্রায় ৫৭ লক্ষ টাকা ছুঁয়ে ফেলবে। অথচ কেন্দ্রীয় কর-কাঠামোয় তাঁদের কর দিতে হবে স্রেফ ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকার ওপর।

বাকি ৫১ লক্ষ টাকাই করমুক্ত, অর্থাৎ 'নীট' লাভ। সুতরাং সচিবের রোজগারের সঙ্গে একজন সাংসদের রোজগারের তুলনা হয় কি করে?

বাস্তবিক, পৃথিবীর কোনও দেশেই সেদেশের মাথাপিছু আভ্যন্তরীণ উৎপাদন হারের (জি ডি পি) এতগুণ বেশি রোজগার কোনও সাংসদ-ই করেন না। মার্কিন দেশে সেখানকার মাথা পিছু আভ্যন্তরীণ উৎপাদন হারের ৩৫ গুণ বেশি রোজগার সেদেশের সাংসদদের। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর, জাপান, ইটালি ও পাকিস্তানের সাংসদরা মাথা পিছু জিডিপির তুলনায় যথাক্রমে ৯, ৮, ৪, ৬, ৭, ১৭ গুণ বেশি রোজগার করেন (সারণী দ্রষ্টব্য)। তবে এদের সবার চাইতে এগিয়ে ভারত। ভারতে মাথাপিছু জিডিপি-র চেয়ে এদেশের সাংসদদের ১০৪ গুণ অধিক রোজগার। ভারতের চেয়ে একমাত্র এগিয়ে কেনিয়া। সেখানকার মাথাপিছু আভ্যন্তরীণ উৎপাদন হারের (জিডিপি) চেয়ে অন্তত ১৮০ গুণ বেশি আয় করেন কেনিয়ার সাংসদরা।

সাংসদদের পাওনা গন্ডা (দেশে-দেশে)

দেশ	দেশ অনুযায়ী সাংসদের প্রাপ্য (বার্ষিক)	সামঞ্জস্য আনার জন্য ক্রয়-ক্ষমতা (ডলারে)	জিডিপি (ডলারে)	জিডিপির তুলনায় সাংসদের আয়
আমেরিকা	১৬,৫৮,১৭৪	১৬,৫৮,১৭৪	৪৭,৭০২	৩৫ গুণ
কেনিয়া	১,৩০,৯২,০০০	৩,২০,১৬০	১,৭৮২	১৮০ গুণ
ইংল্যান্ড	২,১২,৬২৮	৩,১৯,৭৪১	৩৫,০৬৩	৯ গুণ
ফ্রান্স	২,৫৫,৩৫১	২,৮১,২২৪	৩৪,২৫০	৮ গুণ
ভারত	৫৭,০০,০০০	৩,২৮,৭৯৬	৩,১৭৬	১০৪ গুণ
সিঙ্গাপুর	২,২৫,০০০	২,০৭,৯৪৮	৫২,৮৪০	৪ গুণ
জাপান	২,২২,৩০,০০০	১,৯৯,৬৪৬	৩৩,৪৭৮	৬ গুণ
ইতালি	১,৬৮,০০০	১,৯৩,৯০৯	২৯,৩৪৭	৭ গুণ
পাকিস্তান	১৫,২৭,৫৬৪	৪৫,৯০৯	২,৭১৩	১৭ গুণ

* দেশের নিজস্ব কারেন্সির ভিত্তিতে। (সৌজন্যে—টাইমস অব ইন্ডিয়া)

হেডলির স্বীকারোক্তি

২৬/১১-য় জড়িত আই এস আই-লস্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ফের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিলেন ২৬/১১ মুম্বই কাণ্ডে অভিযুক্ত ডেভিড হেডলি। পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক হেডলিকে গত ৩ থেকে ৯ জুন— টানা সাতদিন ধরে ন্যাশানাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এন আই এ) একটি দল চিকাগোতে জেরা করেন। জেরায় উঠে আসে পাকিস্তান সরকার আই এস আই এবং লস্কর-এ-তৈবার সম্পর্ক নিয়ে অনেক অজানা তথ্য। জেরার মুখে হেডলি বলে, ''লস্কর-এ-তৈবার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের পেছনে মূল পান্ডা হাফিজ সঈদ। হাফিজের নির্দেশেই পরিচালিত হোত লস্করের যাবতীয় কাজকর্ম।'' পাকিস্তানের আই এস আই প্রধান লেফটেনান্ট জেনারেল আহমেদ সুজা পাশা রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে মুম্বইয়ের ২৬/১১ কাণ্ডে অভিযুক্ত লস্করের সেনাপ্রধান জাকি-উর-রহমান লাকভির সঙ্গে দেখা করে বলেও জানায় হেডলি। প্রায় ৩৪ ঘন্টা ধরে হেডলিকে জেরা করে এন আই এ। তার জবানবন্দির উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয় একটি রিপোর্টও। রিপোর্টটিতে ২৬/১১ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার, আই এস আই এবং লস্করের সক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়। জেরার মুখে হেডলি জানায়, পাকিস্তান সরকারের মদতে জলপথে একটি অস্ত্র

বোঝাই নৌকো মুম্বইতে নিয়ে আসে লস্করগোষ্ঠী। নৌকোটি কেনার জন্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য করে আই এস আই। মুম্বই কাণ্ডের পর গ্রেপ্তার করা হয় জাকি-উর-রহমান লাকভিকে। তাকে রাখা হয় আদিয়ালা জেলে। সেইসময়, মুম্বইকাণ্ডের ঘটনাটি বিস্তারিত ভাবে বুঝতে তার সঙ্গে জেলে দেখা করেন আই এস আই প্রধান সুজা পাশা।

জেরা চলাকালীন, হেডলির কথায় উঠে আসে ২৬/১১'র অন্যতম পান্ডা লস্করের উচ্চস্তরীয় কমান্ডার সাজিদ মজিদ বা সাজিদমীর বা ওয়াসির নামও। জেলে লাকভির সঙ্গে দেখা করতে গেছিল সাজিদ। একথা খোদ্ সাজিদ তার কাছে প্রকাশ করে

(এরপর ৪ পাতা)

রাজস্থান পুর নির্বাচনে কংগ্রেসকে টেক্কা বিজেপি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাজস্থানে এবার স্থানীয় বিভিন্ন পুরসভার নির্বাচনে শাসক কংগ্রেস দলকে টেক্কা দিল বিজেপি। যেখানে কংগ্রেস জিতেছে ৪৯টি পুরসভা, সেখানে বিজেপির দখলে এসেছে ৫৭টি পুরসভা। মোট ১২৬টি পুরসভার (স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসহ) নির্বাচন হয়। বাদবাকি কুড়িটি গিয়েছে নির্দলদের দখলে। রাজস্থানে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপি কংগ্রেসের কাছে পর্যুদস্ত হয়েছিল। এবার পরিস্থিতি বদল হচ্ছে এবং বিজেপির পক্ষে পরিবেশ অনুকূল হচ্ছে বলেই ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

গতবছর নভেম্বর মাসে যখন ৪৯টি পুরসভার নির্বাচন হয় তখনও বিজেপি'র পক্ষে গিয়েছিল মাত্র ৯টি পুরসভা। তারপর পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বিজেপি সুবিধা করে উঠতে পারেনি। এবারকার

(এরপর ৪ পাতা)

ইমামদের বেতনের দাবি তৃণমূলের

গূঢ় পুরুষ।। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিহারের নেতা লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আর জে ডি) সাংসদরা একযোগে লোকসভায় জোরালো দাবি করেছেন যে মসজিদের ইমামদের সরকারি বেতন ভাতা ইত্যাদি দিতে হবে।

রেল মন্ত্রকের পরিচালনা নিয়ে লালু-মমতারা প্রকাশ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি চালালেও মুসলিম তোষণে কেউ কারও থেকে কম যান না। মুসলিম ভোট পেতে প্রতিবেশী দুই রাজ্যের নেতা-নেত্রী এখন প্রতি সন্ধ্যায় নিয়ম করে 'ইফতার পার্টি'-তে যাচ্ছেন। তাঁরা এই রমজান মাসে রোজা রাখছেন কিনা জানা নেই, তবে মুসলিম ভোট পেতে এতটুকু কষ্ট করতে তাঁদের আপত্তি নেই। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার ভোটের যে আর বেশি দেরি নেই!

সংসদে যখন সাংসদদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে তারই মধ্যে তৃণমূল এবং আর জে ডি সাংসদরা কেন্দ্রীয় সরকারকে ইমামদের বেতন দিতে হবে বলে হৈ-চৈ শুরু করে দেন। তাঁরা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সলমন খুরশিদকে মনে করিয়ে দেন আজ থেকে ১৭

(এরপর ৪ পাতা)

কোরেল বিজ্ঞাপন

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সাংসদদের বেতন বৃদ্ধি

সংসদের সাংসদগণের বেতন বৃদ্ধি লইয়া বিতর্ক বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। এদেশে সরকারি তরফ হইতে বেতন বৃদ্ধি হইলেই যাহারা সেই বেতন বা ডি এ কিংবা বোনাস হইতে বঞ্চি ত, তাহাদের ক্ষেপাইয়া তোলাটাই এক শ্রেণীর বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকার রেওয়াজ। ইহাতে পত্রিকাটাও বেশ কাটতি হয় আবার নিজেদেরও কিছুটা গণভাবমূর্তি গড়িয়া তোলা যায়, বেশ প্রগতিশীল সাজাও যায়। আর বামপন্থী দলগুলি তো জনগণের স্রোতে ভাসিতেই অভ্যস্ত। জনগণের মধ্যে ভেদভাব, ঈর্ষা জাগাইয়া তুলিয়া বাজিমাত করিবার মতলব তাহাদের মজ্জাগত। যেমন এই বামপন্থীদের কর্মচারী ইউনিয়ন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের অধিক বেতন লইয়া ঈর্ষা জাগাইয়াই এবং কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের অধিক হারে বেতন ও ভাতা দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন করিয়া তাহাদের সংগঠন মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করাইয়াছে। অনুরূপভাবে এই বামপন্থীদেরই কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যে সংগঠন রহিয়াছে সেখানে আবার তাহারা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মচারীদের মতো কেন বেতন দেওয়া হইবে না, কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মধ্যে এই ঈর্ষা জাগাইয়া তুলিয়া নিজেদের ট্রেড ইউনিয়নের ভিত মজবুত করিয়াছে। এইভাবে আবার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মচারীদের মধ্যে বেসরকারী বহুজাতিক সংস্থার কর্মচারীদের সম্বন্ধে বিদ্বেষ গড়িয়া তুলিয়া বাজিমাত করিয়াছে। বিদ্বেষের রাজনীতির ধারক-বাহক এই বামপন্থীগণ বরাবরই এই কাজ করিয়াছে। সংসদের সদস্যগণের বেতন এই প্রথম বাড়িল না। আগেও বাড়িয়াছে, বামপন্থীগণ যথারীতি তাহার বিরোধিতা করিয়াছিল। আবার বর্ধিত বেতন দু'হাত ভরিয়া গ্রহণও করিয়াছিল। যখন পেনশন প্রবর্তিত হইয়াছিল তখনও এই বামপন্থীরা তাহার বিরোধিতা করিয়াছিল। আবার সময় মতো তাহারা এই পেনশন গ্রহণও করিতে কসুর করে নাই। বামপন্থী সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় অবসর গ্রহণের পর বহাল তবিয়তে সরকারি গাড়ী, সরকারি নিরাপত্তা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

আবার অন্যদিকে বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকাগুলির খবর যাহারা রাখেন তাহারা জানেন, এই পত্রিকাগোষ্ঠীগুলির মালিকগণ তাহার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন কিরূপ হারে দিয়া থাকেন। সেই কারণে বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীগুলির প্রায় কোনটিতেই কোনরূপ ট্রেড ইউনিয়ন ঝামেলাই নাই। তাহারা কী এখন ঢাকঢোল পিটাইয়া সম্পাদক ইত্যাদিগণের বেতন বৃদ্ধি করেন? তাহারা কী বেতন ছাড়াও গাড়ী, বাড়ি এবং বিভিন্ন ভাতা পান না?

মানুষের মধ্যে ঈর্ষা জাগানো সবচেয়ে সহজ কাজ। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে। তাহার চেয়েও বিশেষ করিয়া সহজ বাঙালীদের মধ্যে ঈর্ষা জাগানো। অপরের চেয়ে কম প্রাপ্তি এক বিষম জ্বালা। যোগ্যতা থাকুক, আর নাই থাকুক। সংসারে অশিক্ষিত, অযোগ্য মানুষদের মুখেও তাহার বাবুর বেতন সম্পর্কে উষ্মা আমরা প্রায়ই শুনি। এটা নিছকই ঈর্ষা প্রসূত ছাড়া আর কিছুই নয়।

অনেকেই বলেন, সাংসদগণ তো দেশের জন্য কাজ করিতে গিয়াছেন। তাহা হইলে তাহাদের আবার বেতন কিসের? এই ব্যাপারে অনেকেই আবার বলেন, সরকারি আমলা, সরকারি সেনা বাহিনী, বায়ু সেনা, নৌ-সেনা প্রভৃতি প্রতিরক্ষাবাহিনীতে যাহারা কর্মরত তাহারাও তো দেশের জন্য কর্মরত। নিদেন পক্ষে নিম্নতম সরকারী কর্মচারীটি পর্যন্ত দেশের সেবাকাজে ছত্রন্দ্বজ্লনন্তন্দ্ব ব্ধপ্স ব্ধড়ন্দ্ব ত্ত্বব্ধনপ্সঞ্চগ্ন নিযুক্ত, তাহারাও তো বেতন পান, ভাতা পান, উচ্চপদস্থগণ বাড়ি, গাড়ী প্রভৃতি সবই পান। উপরন্তু পদোন্নতির সুযোগও তাহারা পান। তাহা হইলে সাংসদগণই বা কেন শুধু শুধু দেশের কাজ করিবেন? তাহারা অপরের বেতন বৃদ্ধি র জন্য লড়াই করিবেন, আর নিজেদের বেতনের জন্য লড়াই করিলেই দোষ, তাহাদের প্রচুর ব্যয় করিয়াই নির্বাচনে দস্তুর মতো লড়াই করিয়াই জিতিয়া আসিতে হয়। নির্বাচনী লড়াই-এ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত না হইলেও সংগঠনগত হিসাবে তো বটেই। সেই কারণেই সম্ভবত বাজপেয়ী সরকারের আমলেই আইনসঙ্গতভাবে দলগুলিকে কর্পোরেট অনুদান গ্রহণের অনুমতি দেওয়ার প্রশ্ন তুলিয়াছিল। এবং সরকারি তরফ হইতেও নির্বাচনী অনুদান দেওয়ার প্রশ্ন তুলিয়াছিল। রাজনীতিতে এই পেশাদারিত্ব আসিলে দলগুলির অর্থব্যবস্থায় একটা স্বচ্ছতা দাবী করা যাইতে পারিত। আয়করও সংগৃহীত হইতে পারিত। যেমন আমাদের ফুটবল দলগুলি অপেশাদার হওয়ায় তাহাদের সমস্ত ব্যয়ই চির অন্ধকারে নিমজ্জিত। কোথা হইতে আসে আর কোথায়ই বা যায়, তাহার কোনও ঠিকানাই নাই। সেই কারণেই মাঠের হালও যেমন খাটাল, আর তাহাতে যাহারা চরিয়া বেড়ায় তাহারাও আর যাহাই হউক খেলোয়াড় মোটেই নহে।

রাজনীতিতে পেশাদারিত্ব আসুক—এটাই কাম্য। অন্ততঃ দেশের জন্য কাজে পেশাদারিত্ব আসিলে ক্ষতি কী। প্রধানমন্ত্রী যদি বেসরকারী মালিকদের নিকট হইতে "কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি" আহ্বান করিতে পারেন, তাহা হইলে "দেশকে লিয়ে করেঙ্গে কাম, কামকে লেঙ্গে পুরা দাম"—একথা সাংসদগণ বলিলেই বা দোষের কিসের? তবে সব কিছুরই মাত্রা আছে, সেই মাত্রা বা মর্যাদারেখার রক্ষার দায়িত্বটি সাংসদদের উপরই বর্তায়—ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

জাতির জীবনে একাধিকবার বহু কঠিন সমস্যা দেখা দেয়। গুরুতর সঙ্ক টের আবির্ভাব হয়। বিপদের ভয়াবহতা দেখিয়া দেশের অনেক লোক ভাবে এই বুঝি সব গেল। সমগ্র জাতির ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু অনেক জাতি এইরূপ জীবন-মরণ সঙ্ক ট হইতেও পরিত্রাণ পাইয়া আবার শক্তি ও সমৃদ্ধি র আসনে উপবিষ্ট হইয়াছে। যে জাতির চরিত্রবল যত বেশি, সে জাতিই সঙ্ক টকালে অবসন্ন হয় না।

—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মন্ত্রী ও মন্ত্রকের অপদার্থতায় ধুঁকছে ভারতীয় রেল

এন সি দে

প্রতিটি বাঙালীমাত্রই ছেলেবেলায় পড়া 'রেলগাড়ী ঝমাঝম...' ছড়াটি জানেন, তাই ছড়াটি পুরো লেখার প্রয়োজন মনে করছি না, তবে ছড়াটি তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করলাম এই কারণে যে আজ মমতার রেলগাড়ী সত্যই লাইনে আর থাকতে চাইছে না, বারবারই পা পিছলে হয় পড়ে যাচ্ছে, না হয় আগে আগে যাচ্ছে, পিছনে পড়ে থাকছে তার বগি; কখনও আবার রিজার্ভ বগি জুড়বার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। নিম্নমানের খাবার কিংবা দূষিত খাবার নিয়ে আর তেমন চিন্তিত নয়। কারণ ট্রেনে উঠলেই তো শুরু হয় মরণের চিন্তা। দেশের অনেক প্রান্তেই রাতে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর আরও আশ্চর্যের কথা, যাদের জন্য রাতে ট্রেন চালানো যাচ্ছে না, তাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্র ও রাজ্য পুলিশের যৌথ অভিযানেরও বিরোধিতা করছেন এই কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী। তারই জোটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম কিন্তু বলে দিয়েছেন, তার কাছে যে গোয়েন্দা রিপোর্ট আছে তাতে অনেক রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই মাওবাদীদের যোগাযোগের উল্লেখ করা হয়েছে।

মমতা রেলমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে গত ১২ মাসে ২০০-র মতো দুর্ঘটনা, গাফিলতি কিংবা চরম দায়িত্বহীনতার মতো ঘটনা ঘটেছে। মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে রেলমন্ত্রীর প্রধান দপ্তর শহর নয়া দিল্লী রেল স্টেশনে। রেলমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যেই (অক্টোবর '৯০-এ) ঘটেছে রেল দুর্ঘটনা মথুরার কাছে। সব চাইতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে খড়্গপুরের অদূরেই। জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়ে পাশের লাইনে পড়ে যাওয়ায় সেই লাইনে আসা একটি মালগাড়ী প্যাসেঞ্জার ভর্তি কামরাগুলিকে গুঁড়িয়ে দেয়। বহু মানুষ এতে প্রাণও হারান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারিয়ে পঙ্গু হয়ে যায় আরও অনেকে। তার পরের মর্মান্তিক ঘটনা বোধ হয় সাঁইথিয়ার ট্রেন দুর্ঘটনা। একশো'র কাছাকাছি মানুষের মৃত্যু এবং দু'শোর কাছাকাছি মানুষ অর্ধমৃত।

এ-তো গেল রেল দুর্ঘটনার কথা। এবার উল্লেখ করছি এমন সব ঘটনার কথা যা ভারতীয় রেলের ইতিহাসে কতবার ঘটেছে, বা আদৌ ঘটেছে কিনা তা জানি না। প্রায়ই শোনা যাচ্ছে, চলন্ত ট্রেন থেকে ইঞ্জিন বিচ্ছিন্ন হয়ে দু'-চার কিলোমিটার একা একাই চলে যাওয়ার পর মনে পড়ছে পিছনে বগি নেই। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার বলুন তো। এ ঘটনা প্রথম ঘটেছে বোধ হয় হাওড়া-মুম্বাই দুরন্ত এক্সপ্রেসে। হাওড়া থেকে সাঁইত্রিশ কিমি দূরে উলুবেড়িয়া স্টেশনের কাছেই ঘটেছে ঘটনাটি। ইঞ্জিনটি কয়েকটি বগি নিয়ে অনেকটাই দূরে চলে যায়। পথচারীদের চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে ড্রাইভারের টনক নড়ে। এর পরের ঘটনা ঘটেছে দেরাদুন থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রেনে। যাত্রীদের হাতে রয়েছে রিজার্ভেশন টিকিট, কিন্তু ট্রেনে সেই রিজার্ভ বগি লাগানোই হয়নি। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। যাত্রীদের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। এরপর ঘটেছে মুম্বাই হাওড়া দুরন্ত এক্সপ্রেসের খাদ্যে আরশোলা। আর ট্রেনের মধ্যে আরশোলার অবাধ বিচরণতো হবেই। কারণ বেশীর ভাগ নয়া ঘোষিত ট্রেনের বগি তো গ্যারেজে বা কারশেডে পড়ে থাকা বগি দিয়েই চলছে।

সাঁইথিয়ার মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরপরই ঘটে গেছে আরও দুটি ঘটনা। প্রথমটি ঘটেছে মুঘলসরাই থেকে কিছুটা দূরে ইস্ট আউটার সিগনালের কাছে। নিউ দিল্লী-পাটনা রাজধানী এক্সপ্রেস এক ঘন্টা দেরীতে মুঘলসরাই আসে। ভোর ৩টেয় ছেড়ে যায়। কিন্তু ইস্ট আউটার সিগনালের কাছে গিয়েই ইঞ্জিনটি বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় ২ কি.মি. এগিয়ে যায়। ইঞ্জিন জুড়ে আবার যাত্রা শুরু করার পর মেরে কেটে ৭০ কিলোমিটার পথ যাওয়ার পর পুনরায় ইঞ্জিনটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবারও ইঞ্জিন প্রায় ২ কিলোমিটার দূর চলে যায়। এবার আর ইঞ্জিনের কাপলিং অনেক কসরত করেও লাগানো সম্ভব হয়নি। সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে মুঘলসরাই থেকে নতুন ইঞ্জিন এনে বেলা ৬.২৭ মিনিটে ট্রেনটি পাটনার পথে রওনা হয়। বাকি পথটুকু যাত্রীরা কি আতঙ্কের মধ্যে কাটিয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এর পরের ঘটনা ঘটেছে পাঞ্জাবের লেহরাগাগার কাছে ২০শে জুলাই '১০-এর সকালে। এখানে এসেই জম্মু-তাওয়াই-কন্যাকুমারী হিমসাগর এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বেশ কয়েক কিলোমিটার চলেও যায়। স্টেশন কর্তৃপক্ষ ওয়ারলেসে ফোনে ড্রাইভারকে খবর দেওয়ার পরে ইঞ্জিনটি ফিরে আসে এবং পুনরায় কাপলিং জোড়া লাগিয়ে দুই ঘণ্টা পর ট্রেনটি ছাড়ে।

এই সকল ঘটনার পিছনে একটিই কারণ আর তা হলো রেলমন্ত্রী ও মন্ত্রকের অপদার্থতা। কিন্তু এত দুর্ঘটনার পরেও রেল মন্ত্রীর তরফে কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়নি। এক একটি ঘটনা ঘটছে আর রেলমন্ত্রী তদন্ত না করেই বলে দিচ্ছেন— এর পিছনে রয়েছে অন্তর্ঘাত ও ষড়যন্ত্র। স্পষ্টতই ইঙ্গিত সিপিএমের দিকে। অনুকূল রাজনৈতিক অবস্থা থাকায় এবং সিপিএম নেতৃত্ব তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারানোয় মানুষ সহজেই মমতার কথা বিশ্বাস করেও যাচ্ছে। ঠিক যেমনটি হয়েছিল সত্তরের দশকে ঠিক আগে থেকে। সেই সময় অকৃতদার সর্বস্বত্যাগী কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেসী নেতাদের বিরুদ্ধে যা খুশি বদনাম দিত এই সিপিএম নেতারা, মানুষ তাই বিশ্বাস করে যেত। এই সহজ, সরল মানুষদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সেদিন বামেরা কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ও বরিষ্ঠ নেতাদের কম হেনস্থা ও অপমান করেনি, আজ ইতিহাসের শোধ নেওয়ার পালা চলছে। আজ সেই কংগ্রেসের বংশধর তৃণমূল কংগ্রেসীরা বামপন্থীদের ফেলে আসা অস্ত্রেই শান দিয়ে প্রয়োগ করতে শুরু করেছে মাত্র। এই ষড়যন্ত্রের বুলি বামেরা ক্ষমতা দখল করার পরও বহু বছর চালিয়েছে। প্রথম কয়েক বছর সব ব্যাপারে বলেছে 'আগের কংগ্রেস সরকার দায়ী'। পরের কয়েক বছর চালিয়েছে কেন্দ্রের চক্রান্ত বলে। তারও পরের কয়েক বছর চালিয়েছে আর একটি রেকর্ড। সেটা হলো—"রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে"। সেই সমস্ত ক্ষমতা দখল ও বজায় রাখার অস্ত্রগুলোই মমতা আজ শানাচ্ছে সেই বামপন্থীদেরই বিরুদ্ধে। এতে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে পশ্চি মবঙ্গ আর তার মানুষেরা। কারণ ষড়যন্ত্রের বুলি আওড়ে সহজে ক্ষমতা দখল ও বজায় রাখা যে শিখে নিয়েছে, তার কাছ থেকে কোনও উন্নয়ন আশা করাই বৃথা। অতএব এ রাজ্যের কোনও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নেই।

> "এই সকল ঘটনার পিছনে একটিই কারণ আর তা হলো রেলমন্ত্রী ও মন্ত্রকের অপদার্থতা। কিন্তু এত দুর্ঘটনার পরেও রেল মন্ত্রীর তরফে কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়নি। এক একটি ঘটনা ঘটছে আর রেলমন্ত্রী তদন্ত না করেই বলে দিচ্ছেন— এর পিছনে রয়েছে অন্তর্ঘাত ও ষড়যন্ত্র। স্পষ্টতই ইঙ্গিত সিপিএমের দিকে। অনুকূল রাজনৈতিক অবস্থা থাকায় এবং সিপিএম নেতৃত্ব তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারানোয় মানুষ সহজেই মমতার কথা বিশ্বাস করেও যাচ্ছে।"

ভারতবর্ষের প্রকৃত উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার কাজে হাত লাগিয়েছিল যে সরকারটি, সেটি হল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার। সব ক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে রেলের উন্নয়ন ও সুরক্ষার দিকে তাকিয়ে বসানো হয়েছিল বিচারপতি এইচ আর খান্নার নেতৃত্বে কমিটি অন রেলওয়ে সেফ্‌টি। ২০০৩ সালে সেই কমিটির পরামর্শে এন ডি এ সরকার গঠন করে ১০ বছরের জন্য ১৭,০০০ কোটি টাকার তহবিল। কিন্তু এ বছরের স্পেশাল রেলওয়ে সেফটি ফাণ্ডের বরাদ্দ অর্থ ৫৭৯ কোটি টাকা কমিয়ে দেওয়া হলো কি কারণে? এন ডি এ সরকার ২০০৪ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার

(এরপর ৪ পাতায়)

ধুঁকছে ভারতীয় রেল

(৩ পাতার পর)

পরের বছরে ২০০৫-এ কংগ্রেস সরকার ওই টাকা ভাঙিয়ে সম্ভবত ১২ মিলিয়ন ইউরো খরচ করে ফ্রান্স থেকে কেনে ১২টি সিমুলেটর।

মমতা ব্যানার্জী রেলমন্ত্রী হয়েই রেল মন্ত্রককে কাজে লাগাচ্ছে তার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে। তার হাতে সময় কম, মাত্র এক বছরবাদেই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন। ওই নির্বাচনে জিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে তিনি বিভোর। ধীরে ধীরে রেলপথ উন্নয়নের সময় তাঁর নেই। রেলের চটজলদি কাজ দেখানোর একটাই পথ, তা হলো গাড়ীর সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া, উনি তাই করতে শুরু করেছেন। গত ১৪ মাসে তিনি শুধু পূর্ব রেলেই বাড়িয়েছেন ৭৬টি নতুন ট্রেন। গত বাজেটেই ঘোষণা করেছেন আরও ১২৮টি ট্রেন চালু করার কথা।

কিন্তু ট্রেন বাড়ালে যে নতুন নতুন রেক তৈরি করতে হবে, ইঞ্জিন তৈরি করতে হবে, ড্রাইভারের ব্যবস্থা করতে হবে, সে সময়তো দিদির হাতে নেই! তাতে কি? গ্যারেজ বা কারশেড তো আছে। সেখানকার পরিত্যক্ত গাড়ী, ইঞ্জিন লাগাও। শুধু জংলা রঙ করলেই হয়ে যাচ্ছে 'দুরন্ত এক্সপ্রেস, ধোওয়া-মোছা করে নিলেই হয়ে যাচ্ছে কোনও-না-কোনও এক্সপ্রেস। এক্সপ্রেস/ মেলের ড্রাইভারের অভাব, বাধ্য করা হচ্ছে প্যাসেঞ্জার কিংবা লোকো ড্রাইভারদের। ট্রেন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন ট্রেন মেইনটেনান্স ও যাত্রী সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখা। এ ক্ষেত্রে স্টাফ বাড়ানো তো দূরের কথা, জানা গেছে রেলে কম সে কম ৮৯,০০০ পদ এখনও খালি রয়েছে, এর মধ্যে ২০,০০০ পদ এই ট্রেন রক্ষণাবেক্ষণ ও যাত্রী সুরক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত।

রেলে রানিং স্টাফ হিসেবে পরিচিত ৫৮০০ বরাদ্দকৃত পদের মধ্যে ১৯ শতাংশ পদই খালি পড়ে আছে। সারাদেশে ১৭,০০০ ট্রেন নিত্য চালানোর জন্য ৯৮,০০০ ড্রাইভারের পদ বরাদ্দ করা আছে। রয়েছে ২৬,০০০;তার ১৪,০০০ জনই অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট। একথা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ স্বীকারও করেছেন। অতএব খালি পদ পূর্ণ করার দায়িত্ব রেলমন্ত্রী অস্বীকার করতে পারেন না।

তিনি তো সবই অস্বীকার করেছেন। তিনি বলছেন, তিনি রেলের দুর্ঘটনা, কিংবা গাফিলতির জন্য কেন দায়ী হবেন? তিনি তো আর অপারেটর নন অর্থাৎ হাতেনাতে কিছু করেন না! তাঁর কথা মেনে নিলে তো কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই কিছু বলা যাবে না, কারণ মন্ত্রীরা তো হাতেনাতে কিছু করেন না। গুজরাটের কোনও এক প্রান্তে একটা-দুটো মুসলমান মারা গেলে মমতাদেবী কেন তবে নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগ দাবী করেছিলেন? সংসদে বাজপেয়ীজীর মতো মানুষের সামনে কেন তবে তিনি অসভ্য আচরণ করেছিলেন? বাজপেয়ী সরকারের পদত্যাগ দাবী করেছিলেন? নিজের দলের সমর্থন প্রত্যাহার করেছিলেন বাজপেয়ী সরকারের উপর থেকে কেন? বাজপেয়ীজী, কিংবা নরেন্দ্র মোদীজী কী নিজেরা তরোয়াল হাতে দাঙ্গা করেছিলেন?

আসলে মমতার প্রশাসনিক কোনও দক্ষতা নেই, তিনি তা এসব কথাবার্তার মধ্যে প্রমাণও করে দিচ্ছেন। তিনি বামপন্থীদের মতো শুধু মাঠে-ময়দানে আবেগপ্রবণ ভাষণ দিতে পারেন, কথায় কথায় বামেরা যেমন মার্ক্সস-লেনিন-মাও-সে-তুঙ-এর বুলি আওড়াতেন, আজ সুসময়ে মমতাও রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিবেকানন্দের বুলি আওড়াচ্ছেন, আদাব, খোদা হাফেজ প্রভৃতি আরবি, ফার্সী, উর্দুও আওড়াচ্ছেন মুসলমানদের খুশি করতে। উনি রাজ্যের ক্ষমতায় এলে রাজ্যের কোনও উন্নতি না হলেও, মুসলমানদের মাথায় তুলে রাখবেন, এটা নিশ্চিত। এখনই তাঁর মঞ্চে টুপিওয়ালা দাঁড়িওয়ালাদের উনি তুলেই রাখেন। রাজ্যের ক্ষমতালাভের স্বপ্নে উনি বিভোর হওয়ায় তিনি হয়ত দেখতে পাচ্ছেন না, কি চরম দুর্নীতি চলছে তাঁর রেল মন্ত্রকে। দুর্নীতিগ্রস্ত আমলারা তার স্বপ্নে ইন্ধন যোগাচ্ছেন একের পর এক ট্রেন, স্টেডিয়াম, হাসপাতাল ইত্যাদি উদ্বোধনের জাঁক-জমকপূর্ণ ব্যবস্থা করে দিয়ে। যেখানে ১৩-১৪ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ড্রাইভার প্রয়োজন, সেখানে অনভিজ্ঞদের দিয়ে মেল/এক্সপ্রেস চালু করানোর টোপ দিয়ে দিচ্ছেন। রেল কর্মচারীদের দেওয়া সূত্রে জানা গেছে, এই আমলাদের দৌরাত্ম্যে নিত্য নিকৃষ্টমানের যন্ত্রপাতি কেনা হচ্ছে, তাদের পূর্বনির্দিষ্ট ঠিকাদারদের কাছ থেকে। এরাই সরবরাহ করছে ট্রেনের ব্রেক সিস্টেমের স্পার্টস্, প্যাসেঞ্জারস্ ইমারজেন্সি ভালব্স, গার্ড ভালব্স (valves), চেক ভালব্স, আইসোলেটিং কক্স্-এর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় যন্ত্রপাতি। নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতিতে জড়িত কর্তা ব্যক্তি তো ধরাই পড়েছেন সিবিআই'র জালে।

মমতা বলেছেন, তিনি নাকি দুর্নীতি রোধে এবং বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন, তাই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। মমতা একজন নারী, ঘটনাকে নারীসুলভ সফ্ট টার্গেটের গল্প ফেঁদে ফায়দা তোলার স্বাভাবিক ক্ষমতা তারও আছে। তিনি অধৈর্য, অসহিষ্ণু। সমালোচনা তিনি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। এদিক দিয়ে তার সঙ্গে বামপন্থীদের তফাত খুবই কম। ক্ষমতা পেলে তিনি যে আরও উদ্ধত হয়ে উঠবেন তা এখন থেকে বোঝা যাচ্ছে। তাকে সমালোচনার মাধ্যমে সংযত করার এখনই উপযুক্ত সময়। রাজ্য বিজেপি কি তার জায়গা নিতে পারবে? আর কিছু না থাক, সদিচ্ছাটুকু থাকলেই হলো। আপাতত তাই যথেষ্ট।

রাজস্থান পুর নির্বাচন

(১ পাতার পর)

এই জয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিজেপি শিবির উল্লসিত। দলীয় কার্যালয়ে কর্মীদের উচ্ছ্বাসে তাদের বাড়তি মনোবলের বহিঃপ্রকাশ দেখা গেছে। সদ্যসমাপ্ত পুরসভার নির্বাচনে সর্বমোট ৩০৯৬টি ওয়ার্ডে নির্বাচন হয়। তার মধ্যে বিজেপি ১,২৪৯টি ওয়ার্ডে জয়লাভ করেছে। কংগ্রেস জিতেছে ১,০৫২টি ওয়ার্ডে। বাদবাকী ওয়ার্ডে জিতেছে ছোট ছোট দল এবং নির্দল প্রার্থীরা। জাত-পাত ভিত্তিক দল বিএসপি গত কুড়ি বছরের মধ্যে এই প্রথমবার দুটি পুরসভা— নওয়ালগড় এবং দেওলি দখল করেছে। আজমীর পুরসভা এই প্রথমবার বিজেপি দখল করল। রাজস্থানে সংশোধিত মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে মেয়র পদে সরাসরি প্রত্যক্ষ নির্বাচন হয়। ফলে অনেক স্থানেই দল পুরসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও মেয়র পদটি অন্য দলের হাতে চলে যায়। এবার অনেক ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা ঘটেছে।

পরলোকে বংশীলাল সোনী

(১ পাতার পর)

স্বয়ংসেবকদের কাছে তিনি ছিলেন প্রেরণার উৎস। কলকাতায় শ্রীমানী মার্কেটের কাছে সরকার বাই লেনে তাঁর পৈতৃক বাড়ী হলেও ১৯৩০-এর ১ মে ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলার চাঁইবাসায় মামার বাড়ীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাবা শ্রীনারায়ণ সোনী ও মা মোহিনী দেবী ভাইবোনেদের মধ্যে তিনি তৃতীয়। তাঁর বড় ভাই অনন্তলাল সোনী আজীবন সঙ্ঘের প্রচারক ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। ১৯৪৯ সালে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে তিনি বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক হন এবং সঙ্ঘের তৎকালীন পূর্ব ক্ষেত্র প্রচারক একনাথজী রানাডের সংস্পর্শে আসেন। তিনি নিজের মাতৃভাষা ছাড়াও বাংলা, ইংরেজী, নেপালী, হিন্দী সহ বেশ কয়েকটি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ১৯৫০ সালে সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে প্রথমে হুগলী জেলার শ্রীরামপুর শহরে যান এবং ক্রমে মালদা ও উত্তরবঙ্গ বিভাগ প্রচারক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৬৮-তে জলপাইগুড়িতে বন্যার সময় উত্তরবঙ্গ বন্যার্ত সেবা সমিতির নামে যে বিপুল সেবাকার্য তাঁরই তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ১৯৭১ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় জওয়ানদের সাহায্যের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা নেন। পূর্ববাংলার ঢাকায় তিনি শাঁখা ও তাঁত যন্ত্র বিতরণের জন্য গিয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবীতে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন। ১৯৭৮-এ প্রৌঢ় সাক্ষরতা অভিযানের বিশেষ দায়িত্বভার তাঁর উপর ছিল। ১৯৮০ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির দায়িত্ব নিয়ে দিল্লী যান এবং দলের প্রধান কার্যালয় প্রমুখের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অসম, উৎকল ও পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে দলের সাংগঠনিক কাজকর্মে যুক্ত ছিলেন। ২০০৩-এ সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্রের বৌদ্ধিক প্রমুখ ও পরে সম্পর্ক প্রমুখ হিসাবে কাজ করেন। শেষে দক্ষিণবঙ্গের প্রাদেশিক কার্যকারিণীর সদস্য ছিলেন। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর বাদ দিলে তিনি ছিলেন সদা সক্রিয়। জীবন ও কর্মে শৃঙ্খলাপরায়ণতা তাঁর ব্যক্তিত্বকে অন্য মাত্রা দিয়েছিল। তাঁর প্রয়াণে সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ এক সুসন্তানকে হারাল।

হেডলির স্বীকারোক্তি

(১ পাতার পর)

বলেও জানায় হেডলি। তবে শুধু সাজিদ নয়, হেডলির জবানীতে সামনে আসে আই এস আইয়ের অন্যতম কর্তা মেজর ইক্বালের নামও। হেডলির কথায়, "২৬/১১ কাণ্ডটিকে সফল করতে তাকে সহযোগিতা করেছিল মেজর ইকবাল। মেজর ইক্বালের সঙ্গে এই কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল মেজর সামির আলিও। তবে শুধু তাকেই নয়, লস্কর-এ-তৈবা'র প্রতিটি কর্মীর পিছনেই নির্দেশ থাকত আই এস আই কর্তাদের। আব্দুল রহমান শহীদ বা হাসিমকে নির্দেশ দিতেন কর্ণেল শাহ। মুজঃফরাবাদের একজন বিগ্রেডিয়ার রিয়াজের কথামতো চলতে হতো জাকি-উর রহমান লাকভিকে। এন আই এ'র রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৫ সাল থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে প্রায় ৯ বার হেডলি ভারতে এসেছিল। তাজবেঙ্গল আক্রমণ

ইমামদের বেতনের দাবি তৃণমূলের

(১ পাতার পর)

বছর আগে ১৯৯৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট মসজিদের ইমামদের বেতন ও ভাতার দায়িত্ব সরকারকে নিতে বলেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ মান্য করেনি। লোকসভায় যেভাবে তৃণমূল-আর জে ডি সাংসদরা আদালতের নির্দেশ ব্যাখ্যা করেছেন তা সঠিক নয়। মামলাটি করেছিল অল ইন্ডিয়া ইমামস্ অর্গানাইজেশন। দাবি ছিল 'সরকার স্বীকৃত' মসজিদের ইমামদের বেতনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সরকার কীভাবে বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উপাসনা কেন্দ্রকে 'সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত' বলে ঘোষণা করতে পারে। মসজিদ এবং মাদ্রাসা এক নয়। মাদ্রাসার শিক্ষকরা সরকারি বেতন পেলে সংলগ্ন মসজিদের ইমাম— মৌলবীরাও রাতারাতি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে যাবেন তা হয় না। সুপ্রিম কোর্টও তার রায়ে সে কথা বলেনি। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট বলেছে যে সরকারি স্বীকৃত ও সাহায্যপ্রাপ্ত মসজিদের ইমামদের বেতন সরকারকেই স্থির করতে হবে। ভারতের সমস্ত মসজিদের ইমামদেরই সরকারি বেতন দিতে হবে এমন কোনও স্পষ্ট নির্দেশ আদালত দেয়নি।

মন্দির, মসজিদ, মঠ, আখড়া, গুরুদ্বারা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার জন্য কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি লাগে কিনা আমার জানা নেই। ভারতের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মাচরণে সরকারি হস্তক্ষেপ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব তাই সাধারণভাবে বেসরকারি হাতেই থাকে। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র মসজিদের ইমামদের বেতন সরকার দিলে প্রশ্ন উঠবে হিন্দু মন্দির অথবা গুরুদ্বারারা সেবায়েতদের বেতন-ভাতা সরকার দেবে না কেন? হ্যাঁ, লোকসভায় বিতর্ক চলাকালে ঠিক এই কথাই বলেছেন বিজেপির দুই সাংসদ যোগী আদিত্যনাথ এবং বিজয়া চক্রবর্তী। তাঁদের স্পষ্ট দাবী মসজিদের ইমামদের বেতন দিলে ভারতের আট লক্ষ মন্দিরের সেবায়েতদেরও বেতন ভাতা দিতে হবে। দাবিটি যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। ভারতে সরকারি মসজিদ হতে পারে না। সেক্ষেত্রে সংবিধানে লেখা 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' কথাটি বাদ দিতে হবে।

তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে মসজিদের ইমামরা সকলেই চরম অর্থ সঙ্কটে আছেন। সুদীপবাবু এই তথ্যটি কীভাবে পেলেন সেকথা তিনি জানাননি। লোকসভায় 'জিরো আওয়ারে' পশ্চিমবঙ্গের ইমামদের আর্থিক দুর্দশার কথাটি তুলে ধরতে তাঁকে ইমামদের সংগঠন অনুরোধ জানিয়েছিল কিনা সেই কথাও তিনি বলেননি। তবে হঠাৎ লালু-সুদীপ হাত মিলিয়ে একযোগে 'ইমামদের বেতন সরকারকে দিতে হবে' এমন আওয়াজ তুললেন কেন? উত্তর এক কথায়, বিধানসভার নির্বাচন যে দুই রাজ্যেই এসে গেল। মুসলিম ভোটটা যে চাইই চাই।

কার্যকর করার উদ্দেশ্যে নেপাল ও বাংলাদেশ থেকেও অনেক জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রবেশ মুম্বইতে হয়েছিল। ২০০৮ সালের পর থেকেই এই ঘটনার সম্বন্ধে একাধিক আলোচনা সভারও আয়োজন করেছিল লস্কর-এ-তৈবা। সম্প্রতি প্রকাশিত এন আই এর এই রিপোর্ট ভারতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কতটা উন্নত করতে পারবে সেই ব্যাপারে প্রশ্ন থাকলেও, বিভিন্ন প্রশাসনিক মহলে তা যে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

রাজ্য রাজনীতি

ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ

নিশাকর সোম

এ-রাজ্য এক ভয়াবহ রাজনৈতিক সংঘর্ষের দিকে এগোচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর লালগড়ের সভার কয়েকদিন পরেই মাওবাদী নেতা কিষেণজি এক প্রস্তাবে বলেছেন যে, তিনমাস 'যুদ্ধ বিরতি' করা হোক। সেইসঙ্গে চিদাম্বরম ও অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগও চাওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, লালগড়ের সভায় মমতা মাওবাদী নেতা আজাদের মৃত্যুকে এনকাউন্টারে মৃত্যু না-বলে 'হত্যা' বলে বর্ণনা করেছেন। এই উক্তি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরম-এর বক্তব্যের বিপরীত। মাওবাদী নেতা কিষেণজি যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা তিনমাস আগে মাওবাদী নেতার পত্রালাপে দেখা গিয়েছিল। সেই সকল পত্রালাপ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনমাস সময় নিয়ে নতুন করে প্রস্তুতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে। কিষেণজি-এর মৌখিক প্রস্তাব সম্পর্কে চিদম্বরম-এর বক্তব্য, লিখিত প্রস্তাব দিতে হবে।

এদিকে মমতা ব্যানার্জির এনিয়ে একেবারে উল্টো মন্তব্য সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব চুপচাপ। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কংগ্রেস নেতা কেশব রাও বলেছেন "মমতার মধ্যস্থতার প্রস্তাবে কোনও অন্যায় নেই।" তিনি আরও বলেছেন, অন্ধ্রের নকশাল-মাওবাদীদের সঙ্গে তিনি নিজেই মধ্যস্থতার কাজ করেছিলেন। প্রসঙ্গত, অন্ধ্রে জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতা সীতারামাইয়া-এর সঙ্গে নাকি বোঝাপড়া করে কংগ্রেস চন্দ্রবাবুর পরাজয় নিশ্চিত করেছিল। এ-কথা পশ্চিমবঙ্গের এক শীর্ষস্থানীয় প্রাক্তন নেতা সংবাদপত্রে এক লেখায় উল্লেখ করেছিলেন। নির্বাচনে জেতার জন্য এবং কেন্দ্রে কংগ্রেস শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য কংগ্রেস মমতার যে কোনও বক্তব্য এখন চুপচাপ মেনে নেবে। কারণ কংগ্রেস চাইছে,— (১) বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-তৃণমূল জোট জয়ী হলে কংগ্রেস সেই মন্ত্রিসভায় স্থান নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করতে পারবে। সব থেকে বড় কথা, এ-রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতার ভাগ না-নিলে রাজ্যের কংগ্রেস পার্টি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে সাইনবোর্ড পার্টিতে পরিণত হবে। তাই রাজ্যের কংগ্রেস-কে মমতার অনুসারী হবার জন্য কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব নির্দেশ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব মমতা সম্পর্কে যে-নরম মনোভাব নিয়েছেন, তাঁর পিছনে আরও কিছু আশঙ্কা রয়েছেন। তাঁরা জানেন মমতা একজন অস্থিরমতি রাজনীতিক। হঠাৎ করে তিনি যেমন এন ডি এ ত্যাগ করেছিলেন তেমনিভাবে যদি ইউপিএ ত্যাগ করেন! আর সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-কে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারেন। কারণ কংগ্রেস নেতারা দেখেছেন, যে সোমেন মিত্রের জন্য মমতা তৃণমূল কংগ্রেস গড়েছিলেন, সেই সোমেন মিত্র বস্তুত মমতার কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজের আখের গুছিয়ে নিয়েছেন। পাঁচ বছরের জন্য সাংসদ থাকার গ্যারান্টি। তারপর না-হয় সাংসদের পেনসন নিয়ে দিব্যি থাকা যাবে! এদিকে রটনা হলো, সোমেনবাবুর এ-রাজ্যে একাধিক স্থানে নাকি জমি কেনা আছে। এ ব্যাপারে সিপিএম তাঁদের বন্ধুকে যথোচিত সহায়তা দিয়েছিল। তার ফল এখন হাড়ে হাড়ে পাচ্ছে। সিপিএম-এর লালু আলম মমতাকে প্রহার করে তার নেত্রী হবার বীজ বপন করেছিলেন। সেটি আজ বিরাট মহীরূহতে পরিণত হয়েছে।

আজকে পশ্চিমবঙ্গের দুর্দশা এবং রক্তাক্ত অবস্থার কারণ জ্যোতি বসু-বুদ্ধদেবের মুখ্যমন্ত্রিত্বে চলা প্রায় সাড়ে তিন দশকের বাম তথা সিপিএম সরকারের কীর্তিকলাপ। তাই তো সিপিএম-এর কোমর ভেঙে গেছে, উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের পর সিপিএম-এর আরও দুরবস্থা হবে। ঠিক এরই ইঙ্গিত মিলেছে তৃণমূল নেতা তথা বিধানসভার বিরোধী নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে। তাঁর বক্তব্যের দু'টি কথা উল্লেখ করছি। (১) "আগামী নির্বাচন সিপিএম-রক্তাক্ত করতে চাইছে।" এর অর্থ হলো তৃণমূলও তার 'প্রতিরোধ' গড়ে তুলবে। ইতিমধ্যে লোকসভায় তৃণমূলী সাংসদগণ ধরনা দিয়ে সিপিএম-এর সন্ত্রাস-এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, তিনি সিপিএম-এর অস্ত্র মজুত সম্পর্কে রিপোর্ট নেবেন।

> **"পার্থবাবুর বক্তব্যের আর একটি ভয়ঙ্কর মন্তব্য হলো—"রোজার সময়ে রাজ্যে সংখ্যালঘু অর্থাৎ মুসলিম হত্যা করছে সিপিএম।" এটা কি সাম্প্রদায়িক উস্কানি নয়? এর সঙ্গেই উল্লেখ করতে হয়, পৌর নির্বাচনের আগেই সিপিএম-এর রাজ্য-সম্পাদক বিমান বসু বলেছিলেন, "এবারের নির্বাচন হবে রক্তক্ষয়ী।" এ থেকে স্পষ্ট দুই যুযুধান পক্ষ 'লড়াই-এর' প্রস্তুতি করছে।"**

পার্থবাবুর বক্তব্যের আর একটি ভয়ঙ্কর মন্তব্য হলো—"রোজার সময়ে রাজ্যে সংখ্যালঘু অর্থাৎ মুসলিম হত্যা করছে সিপিএম।" এটা কি সাম্প্রদায়িক উস্কানি নয়? এর সঙ্গেই উল্লেখ করতে হয়, পৌর নির্বাচনের আগেই সিপিএম-এর রাজ্য-সম্পাদক বিমান বসু বলেছিলেন, "এবারের নির্বাচন হবে রক্তক্ষয়ী।" এ থেকে স্পষ্ট দুই যুযুধান পক্ষ 'লড়াই-এর' প্রস্তুতি করছে।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম বিতাড়িত হলে সিপিএম-এর চার দশকের অত্যাচার অবিচারের শোধ জনগণ (?) নিতে চাইবে? এই জনগণ-এর সঙ্গে সিপিএম-এর মাসলম্যান— যাঁরা নির্বাচনী বৈতরণী পার করেছিল, তাঁরা এবার জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়ে সিপিএম-কে পেটাবে না? তখন নেতারা লুকিয়ে পড়বেন আর নিচের কর্মীরা মার খাবেন। ইতিমধ্যে দু'একজন নেতা ভিনরাজ্যে জমি-জিরেত কিনছেন। শোনা যায়, একজন পরাজিত সাংসদ রাজস্থানে জমি-বাড়ি কিনেছেন আর দিল্লীতে পার্টির সদর দপ্তরে নেতাগিরি করছেন। এখন থেকেই সিপিএম আন্ডারগ্রাউণ্ড সংগঠন করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। তার সুযোগ নিচের তলার কর্মীরা পাবেন না। তাঁরা মার খাবেন! যেমনটি হয়েছিল ১৯৭১-৭২-এ।

এ-রাজ্যে এইভাবেই ধীরে ধীরে রক্তক্ষয়ী হাঙ্গামার দিকে এগোচ্ছে। এই অবস্থা কে রোধিবে হায়! চারিদিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস?

বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-বিনয়— এই গ্যাং অফ ফোর বা দুষ্ট চতুষ্টয়-এর অপসারণ না করা হলে অবস্থা সামলাবার নেতৃত্ব সিপিএম-এ তৈরি হবে না।

অ যা ব রকম

বিলেতে মৎস্য-পুরাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কি বলবেন একে? মাছে-ভাতে বাঙালী তবে এতদিনে স্বীকৃতি পেল? কারা স্বীকৃতি দিল?— কেন বৃটিশ সাহেবরা! যারা বাঙালীর মৎস্য ভক্ষণ নিয়ে কটাক্ষটা প্রথম বাজারে ছেড়েছিল। তারাই কিনা মাছের শ্রাদ্ধ করছে ঘটা করে! না, পয়সা ওড়ানোর খেয়াল ভাবলে ভুল করবেন। সুদূর বিলেতে বহু বছর ধরে হাজার হাজার মানুষের হাসি-কান্নার সাথী হয়েছিল একটি মস্ত বড় বাঙালীর আদরের রুই মাছ। শ্রদ্ধার সঙ্গে তার পারলৌকিক কর্ম সম্পাদন হলো গত স্বাধীনতার দিন লণ্ডনের বুকে। তবে শ্রাদ্ধের পর সেই মৎস্য ভক্ষণও অনিবার্য। শুধু মাছ না বলে তাকে দৈত্য-রুই (জায়েন্ট কার্প) বলেই অভিহিত করছেন স্থানীয় সাধারণ মানুষ। মাছটির ওজন প্রায় দু'টন। মাছটির সঠিক জন্মসাল জানা না গেলেও, অনুমান করা যেতে পারে তার বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে। কেন্টের আশফোর্ডে কানিং ব্রুক হ্রদে দিব্যি খেলে বেড়াত রুইমাছটি। সম্প্রতি মাছটি ভেসে ওঠে। দেখতে পেয়ে বৃটিশ মৎস্যজীবীরা তাকে জালে ধরে। ওয়াকিবহাল মহল বলছে, ওই রুই মাছটি তার নিজস্ব সময়ে বলতে গেলে একপ্রকার প্রবাদ-প্রতিম (লিজেন্ড)-ই ছিল। প্রথমত, অত বড় আকার এবং ওজনের রুই মাছ শুধু বৃটেন কেন, বিশ্বেই প্রায় বিরল। দ্বিতীয়ত, মাছটির সাঁতার কাটা, পাখনা-ঝাপ্টানো এবং খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি মৎস্যজীবীদের কাছে তাকে অনেকটাই অন্তরঙ্গ করে তুলেছিল। মাছটিকে মারলেও যারা এতদিন খুব কাছ থেকে দেখেছিল তাদেরকে একটু হলেও শোকাহত করেছে। সেই কারণে হিন্দু রীতি মেনেই ওই দৈত্য-রুইয়ের শ্রাদ্ধ বাসর সাজানো হয়েছিল ফুলের মালা আর পুষ্পস্তবক দিয়ে। উপস্থিত দর্শকের যে দু'ফোঁটা চোখের জলও পড়েনি তাও নয়। আসলে মাছটিকে ধরাই ছিল বিশাল চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। সেই মাছের ঝোল বৃটিশদের মুখে কতটা রুচবে বা আদৌ রুচবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু বৃটিশদের প্রতিবেশী ইউরোপীয় ইউনিয়নের লোলুপ দৃষ্টি এই মাছটার ওপরে পড়েছে। মাছের শ্রাদ্ধ নিয়ে রীতিমতো কটাক্ষ করেছে বৃটিশদের। আপাতত সেটাকে পাত্তাই দিচ্ছে না বৃটিশরা। বরং তারা অনেক বেশি স্মৃতিকাতর মাছটিকে নিয়ে। তাঁরা জানালেন, বিগত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে মাছটিকে জালে ধরবার বহু চেষ্টা হয়েছে। যদিও বেশ কয়েকবার ধরা পড়ার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাষট্টি বছর বয়সী মধ্য কেন্ট ফিশারিজের ম্যানেজার ক্রিস লংসডন জানালেন, 'মাছ-ধরাদের দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ কাজটা আমরা করে ফেলেছি ওই বিশালাকৃতি মাছটিকে ধরে।'

দু'টন ওজনের সেই বিশালাকৃতি দৈত্য-রুই।

সবশেষে বলতেই হচ্ছে, রুই মাছ প্রিয়তায় বৃটিশরা বাঙালীদের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করলেও বাঙালী ও বৃটিশের স্বভাবে কিছু পার্থক্য আছে। যেমন, বাঙালীদের স্নেহের স্বভাবই হলো, অকারণে অমঙ্গল আশঙ্কা করা। অন্যদিকে, বৃটিশরা কারুকে যতই স্নেহ করুক সেটা আদতে মাছের মায়ের পুত্রশোক গোছের। দু'টন ওজনের রুইটিকে ধরে মেরে ফেলাই তার প্রমাণ।

আরও একটা পার্থক্য, বাঙালীরা যেমন সবকিছুরই নামকরণ করে, বৃটিশরা কিন্তু তেমন নয়। তাই চল্লিশ বছর ধরেও ওই মাছটির নামকরণ হয়নি।

বাংলাদেশী বিতাড়নে চাই গণ-আন্দোলন : সুষমা স্বরাজ

সংবাদদাতা ॥ অসম থেকে বাংলাদেশীদের বিতাড়নের পক্ষে জোরদার সওয়াল করলেন লোকসভার বিরোধী দল-নেত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ। তাঁর মতে অসমে আবারও আশির দশকের মতোই জোরদার গণ-আন্দোলনের প্রয়োজন। ছাত্র-যুবদের এই আন্দোলন পুনরায় সংগঠিত করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন শ্রীমতী স্বরাজ। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কথা দেন— এরকম আন্দোলনে তাঁর দল বিজেপি সর্বতোভাবে সহায়তা করবে।

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি গুয়াহাটিতে ''অসম অগ্রগতির জন্য পিছন ফিরে দেখা, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের বিষয়ে আলোকপাত''— শীর্ষক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিল শহরের 'নর্থইস্ট পলিসি ইনস্টিটিউট'। সেখানেই বিশেষ আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বক্তব্য প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেন শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ।

শ্রীমতী স্বরাজ অল অসম স্টুডেন্ট ইউনিয়নের ব্যাপক গণ-আন্দোলনকে তত্ত্বগতভাবে সমর্থন করে বলেন, 'অসম চুক্তি ১৯৮৫ এবং আই এম ডি টি আইন' ছিল এক মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ। চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল অসম থেকে বাংলাদেশীদের বিতাড়ন— যা একেবারেই পূরণ হয়নি। বাংলাদেশ থেকে অসমে অবৈধ অনুপ্রবেশ অসমের জনবিন্যাসকে একেবারে বদলে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ অসমের মূল নিবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে, পরিচিতিকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। এদিক থেকেও অসম চুক্তি চূড়ান্ত ব্যর্থ। বিজেপি সদা-সর্বদা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকে দেশের নিরাপত্তার পক্ষে সাঙঘাতিক বিপদ বলেই মনে করে।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে অসমকে রক্ষা করার জন্য আরও এক দফা ব্যাপক আন্দোলনের প্রয়োজন। শ্রীমতী স্বরাজ আরও বলেন, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা (পড়ুন বাংলাদেশী মুসলমানরা) অসমের উর্বর নদীর চর, সংরক্ষিত বনাঞ্চ ল এমনকী বিভিন্ন বৈষ্ণবীয় সত্রের জমি জবরদখল করে বসতি স্থাপন করছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন— এসব যদি অসমের নিরাপত্তা এবং মূল অধিবাসীদের সংস্কৃতির পক্ষে সমূহ বিপদ না হয় তাহলে কি? কেউই বলতে পারবেন না অসমে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের প্রকৃত সংখ্যা কত? রাজ্য সরকার এবং ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল আলাদা আলাদা সংখ্যা দিচ্ছেন। অনুপ্রবেশ অসমের জনবিন্যাসে ভয়াবহ পরিবর্তন ঘটিয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজ্য সরকার এই বিপদকে অবহেলা করেছে। উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার মতো ছোট জেলাতেও এক হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি। তাহলে যে কেউ অনুমান করুন সারা রাজ্যে আর্থিক দুর্নীতির পরিমাণ কতটা হতে পারে?

গুয়াহাটির বরিষ্ঠ সাংবাদিক ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'অসম চুক্তি-১৯৮৫' একটি মেয়াদ উত্তীর্ণ চেক-এর সমান। ওই চুক্তি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নে ব্যর্থ প্রতিপন্ন। ২৫ মার্চ, ১৯৭১-কে ভিত্তিবর্ষ (ওই তারিখ পর্যন্ত আগতদের ভারতীয় বলে স্বীকার করা) বলে মেনে নেওয়াটাও এক চরম ঐতিহাসিক ভুল। আলোচনাসভার প্রথম অধিবেশনের বিষয় ছিল— 'জনবিন্যাস, জমির অধিকার এবং নাগরিকত্ব'। প্রধান বক্তা ছিলেন গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত 'দি সেন্টিনেল' পত্রিকার অসমীয়া সংস্করণের সম্পাদক শ্রী বিকাশ শর্মা। তিনি তাঁর বক্তব্যে বর্তমান নবীন প্রজন্মকে পরিস্থিতির বাস্তবতা

ভাষণরত সুষমা স্বরাজ।

অর্থাৎ 'অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ' বিষয়ে সতর্ক করেন। বলেন, বৃহত্তর ইসলামী বাংলাদেশ গঠনের সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে ক্রমাগত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে অসমের মূল অধিবাসীদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র চলছে। এটাই প্রকৃত বাস্তব। হয়তো তথাকথিত ছদ্ম-সেকুলারবাদীরা একথা স্বীকার করতে চাইবেন না। তবুও ঘটনা হলো, বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়ে বসা পাকিস্তানী গোয়েন্দা বাহিনী (আই এস আই) দেশভাগের অসমাপ্ত পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে সচেষ্ট। অসমকে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করতে তারা সক্রিয়। এটা এক চূড়ান্ত বাস্তবতা। কুখ্যাত 'আই এম ডি টি' আইন উঠে যাওয়ার পরেও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। প্রকৃত পরিস্থিতি হলো, অসমে কোনও অভিবাসন বিষয়ক আইনই নেই। কারণ, রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের রাজ্য থেকে বাংলাদেশীদের চিহ্নিত করে তাদের স্বদেশে ফেরৎ পাঠাবার কোনও সদিচ্ছাই নেই। শ্রীশর্মা নতুন প্রজন্মকে এই ভয়াবহ সমস্যাকে সততা ও গম্ভীরতার সঙ্গে উপলব্ধি করতে অনুরোধ জানান।

অসমে তাবৎ মুসলমানদের সার্বিক স্বার্থরক্ষাকারী দল এ আই ইউ ডি এফ (পূর্ববর্তী নাম অসম ইউনাইটেড মাইনরিটি ফ্রন্ট) এর কার্যকরী সভাপতি হারুণ রসিদ আলম চৌধুরীর বক্তব্য— অনুপ্রবেশ রাষ্ট্রের পক্ষে ভয়াবহ বিপদ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সীল করা হলে হয়ত অনুপ্রবেশ ঘটত না। বি এস এফ কখনও চিহ্নিত বাংলাদেশীদের বাংলাদেশী সীমান্তরক্ষী বাহিনী বি ডি আর-এর হাতে তুলে দেয় না। সীমান্তে জঙ্গলে ছেড়ে দেয়। তারা আবার অসমেই ফিরে চলে আসে। ভারত সরকারকেই এবিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বাংলাদেশীদের অসম থেকে বের করে সঠিক নাগরিক সূচী তৈরি করতে হবে। এজন্য তিনি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে ঐক্যমত্যে আসার পরামর্শ দেন।

সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গুয়াহাটি হাইকোর্টের আইনজীবি সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, শান্তি আলোচনার পক্ষপাতী আলফা নেতা মৃণাল হাজারিকা, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ননীগোপাল মহন্ত এবং বি বি সি-র পূর্বাঞ্চ লীয় সংবাদদাতা সুবীর ভৌমিক।

এদিকে বিগত ২৫ বছরের মধ্যে অসম চুক্তি কার্যকর করাতে ব্যর্থতার জন্য আসু (অল অসম ছাত্র ইউনিয়ন) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে একচোট নিয়েছে। আসু নেতাদের বক্তব্য এরমধ্যে বহিস্কৃত বাংলাদেশীরা অসমে ফিরে এসে স্থায়ী আস্তানা গেড়ে বিধানসভার নির্বাচনেও প্রার্থী হয়েছে। আবার গুয়াহাটি হাইকোর্টে পিটিশন করে নিজেদেরকে ভারতীয় বলে নাগরিকত্ব দাবী করেছে। আসু এই ব্যর্থতার বিষয়ে 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করেছে। চুক্তিতে বলা ছিল, ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১-র মধ্যে ভোটার তালিকায় যে সকল বিদেশীর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের চিহ্নিত করে বাদ দেওয়া হবে। অথচ তা করা হয়নি পঁচিশ বছরের সময়সীমার মধ্যে, এমনকী রাজ্যের মূল অধিবাসীদের সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানেও সরকার ব্যর্থ। আসুর দাবী রাজ্য বিধানসভা, লোকসভা এবং স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচনে ১০০ শতাংশ আসনই অসমের মূল অধিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। আসুর মতে এ জি পি-র প্রফুল্ল মহন্ত সরকারও কিছুই করেনি।

মাও-দুর্গ বস্তারের উন্নয়নে এগিয়ে এলো এন এম ডি সি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চ ল জগদলপুর। মাওবাদীদের দাপটে সর্বদাই কম্পিত ও স্তব্ধ সেখানকার জনজীবন। কিন্তু তবুও স্বপ্ন দেখতে ভোলেনি সেখানকার মানুষ। শেষ হয়নি তাদের প্রহর গোনা। জীবনের প্রতিটি মূহূর্তে তারাও স্বাদ পেতে চায় নিত্য নতুন পরিবর্তনের।

তবে এবার বোধহয় ঘটতে চলেছে তাদের যাবতীয় প্রতীক্ষার অবসান। কারণ তাঁদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসছে ভারতের বৃহত্তম লৌহ আকরিক প্রস্তুতকারক সংস্থা এন এম ডি সি।

সম্প্রতি, এন এম ডি সি-র সূত্রে জগদলপুরে তিন মিলিয়ন টনের একটি গ্রীনফিল্ড ইস্পাত কারখানা নির্মাণ করার কথা জানানো হয়েছে। তবে এন এম ডি সি-র সূত্রানুযায়ী, কারখানার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কার্যকারিতার স্বার্থে নিয়োগ করা হবে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের। সেইজন্য দরকার নিরক্ষরতার অন্ধকার ঘুচিয়ে শিক্ষার বিকাশ। দরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও। সেকারণে ইস্পাত কারখানার কর্তৃপক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়তেও পিছুপা হননি। তবে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন সে দায়ভারও কাঁধে তুলে নিয়েছে এন এম ডি সি।

পড়ুয়াদের পড়াশুনার পাশাপাশি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটিতে থাকবে তাদের বসবাসের ব্যবস্থাও। বিপুল অর্থব্যয়ে তৈরি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করা হয়েছে গত ১৭ আগস্ট। উপস্থিত ছিলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিং।

এন এম ডি সি-র কর্মকর্তাদের কথায়, অঞ্চ লের উন্নতির স্বার্থে নির্মাণ করা হবে ৪০টি নতুন স্কুল ও ৯টি হোস্টেল। শুধু তাই নয়, সংস্কার করা হবে ২১টি স্কুলকেও। এছাড়া, দান্তেওয়াড়া ও নগরনারে গড়া হবে দুটি পলিটেকনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

এন এম ডি সি-র সি এম ডি রানা সোম বলেন, ''আমরা প্রত্যেক স্থানীয় মানুষকে ভবিষ্যতে স্টীলপ্ল্যান্টে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করতে চাই। এর জন্য দরকার যথার্থ শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠান।'' 'কথায় বলে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়'। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উন্নতির আলো দেখিয়ে এই প্রবাদবাক্যটির যথার্থতা ফের আরেকবার প্রমাণ করল এন এম ডি সি।

বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমেই ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে। জগদলপুরের যে মানুষরা দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, পড়াশুনার চিন্তা তাদের কাছে তাই গল্পকথা মাত্র। একথা বুঝেই এইসব মানুষের শিক্ষার যাবতীয় খরচও বহন করছে এন এম ডি সি। শুধু তাই নয়, পড়াশুনার পাশাপাশি বহন করা হবে পড়ুয়াদের পোষাক ও বইখাতার খরচ। বন্দোবস্ত থাকবে বিনোদনেরও।

আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে আছে ডি এ ভি পাবলিক স্কুল। এন এম ডি সি-র এই উদ্যোগে ব্যাপকভাবে

রমণ সিং

এগিয়ে এসেছে স্থানীয় মানুষরাও। এই প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে প্রচুর মানুষ তাদের জমিও দিয়েছে। তবে সব থেকে বেশী উৎসাহিত অঞ্চ লের ক্ষুদে পড়ুয়ারা। যে সব পরিবার জমি দিয়েছে, সেইসব পরিবারের প্রায় ২০০ জন পড়ুয়া ইতিমধ্যে ভর্তি হয়ে গেছে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। এছাড়া, ৮০ জন পড়ুয়াকে অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চ ল থেকে ভর্তির সুযোগ করিয়ে দিয়েছে এন এম ডি সি। পাশাপাশি অঞ্চ ল থেকেও প্রায় ১২০ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে। সি এম ডি রানা সোমের কথায় ''আমাদের লক্ষ্য স্থানীয় ছেলেদের শিক্ষিত করা। কারণ ইস্পাত কারখানা নির্মিত হলে, স্থানীয় ছেলেদেরই কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হবে।'' তবে পড়ুয়াদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকদের উদ্দীপনাতেও বেশ সন্তুষ্ট সি এম ডি। তিনি জানান, প্রকল্পটির স্বার্থে ১৫০০ বিঘা জমির মধ্যে প্রায় ৭৮৮ বিঘা জমিই দান করেছে স্থানীয় কৃষিজীবীরা। বাকি জমি সংগ্রহের ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে সরকার। ইস্পাত কারখানাটির নির্মাণকার্য শুরু হবে এই বছরের অক্টোবর মাসে এবং কারখানাটি আগামী তিন বছরের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে। এই ইস্পাত কারখানা যে অঞ্চ লের উন্নতি-সাধনেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এ ব্যাপারেও আশা প্রকাশ করেছেন রানা সোম।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পরিবহনের দিকেও যথেষ্ট উদ্যোগী হয়েছে এন এম ডি সি। স্কুল থেকে ১০ কিলোমিটার দূরত্বে যাদের বাড়ি, তাদের জন্যে বাস পরিষেবা চালু করা হবে। বস্তার, দান্তেওয়াড়া, বিজাপুর, কানকার ও নারায়ণপুরের মতো প্রত্যন্ত জেলা থেকে পড়ুয়াদের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার ব্যাপারে সবরকম সহযোগিতা করবে এন এম ডি সি কর্তৃপক্ষ।

প্রত্যন্ত অঞ্চ লে বসবাসকারী এইসব বাসিন্দাদের এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত করানো মোটেই সহজ কাজ ছিল না বলে স্বীকার করেন এন এম ডি সি-এর একজন কর্তা। 'যারা মাওবাদীদের দাপটে অঞ্চ লের বাইরে বেরতে সাহস পেতেন না, তাদের ঘরের সন্তানেরা পড়াশুনা করবে এ যেন তাদের চিন্তার বাইরে ছিল। কিন্তু আমরা আমাদের প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সফল। 'ভবিষ্যতে যে এই অঞ্চ ল ইস্পাত কারখানার দৌলতে বিখ্যাত হয়ে যাবে এ ব্যাপারেও তিনি নিশ্চি ত।

কোরেল বিজ্ঞাপন

কোরেল বিজ্ঞাপন

কোরেল বিজ্ঞাপন

কোরেল বিজ্ঞাপন

তন্ত্রে কৃষ্ণ ও ঝুলন প্রসঙ্গ

নবকুমার ভট্টাচার্য

অনেকেরই ধারণা তন্ত্রে কেবল শক্তিপুজোর কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। তন্ত্র গ্রন্থে বৈষ্ণব দেবতার প্রসঙ্গও দেখতে পাওয়া যায়। রাধাতন্ত্র তন্ত্রশাস্ত্রের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শক্তির উপাসকরূপে শ্রীকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত

বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের মতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনযাত্রা শাক্ত উপাসনার জীবন্ত চিত্র। রাধার সঙ্গে মিলনেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনে সিদ্ধিলাভ হয়। প্রসঙ্গত এই গ্রন্থে রাধা ও কৃষ্ণের উপাসনার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে বৈষ্ণব গ্রন্থ বলে মনে হলেও এই গ্রন্থখানি মূলত শাক্তধর্মের রহস্য ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত।

রাধাতন্ত্রে রয়েছে, মহাদেব একবার শরণাগত জিজ্ঞাসু বিষ্ণুকে ত্রিপুরাসুন্দরী ভজনা করবার উপদেশ দিলে বিষ্ণু ওই দেবীর আরাধনা আরম্ভ করলেন। উল্লেখ্য, ত্রিপুরাসুন্দরী দশমহাবিদ্যার এক দেবী। কিন্তু দীর্ঘকাল সাধনা করেও বিষ্ণু সিদ্ধিলাভ করতে পারলেন না। অবশেষে দেবী বিষ্ণুর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হবে না, কারণ আমার অংশভূতা দেবী লক্ষ্মীকে ত্যাগ করে তুমি বৃথাই তপস্যা করছ। তুমি মধুরায় যাও, সেখানে রাধারূপে অবতীর্ণ আমার দূতী পদ্মিনীর সঙ্গ কর। পদ্মিনীও তখন আবির্ভূতা হয়ে বললেন, তুমি সত্বর ব্রজে গমন করো, সেখানে তোমার সঙ্গে আমি কুলাচার অনুষ্ঠান করবো। তোমার আগেই বৃকভানুর গৃহে আমার জন্ম হবে। চৈত্রমাসের পূয্যা নক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে যমুনা নদীর জলে পদ্মমধ্যে উজ্জ্বল ডিম্বাকারে পদ্মিনী আবির্ভূত হলেন। মহাকালীর উপাসক বৃকভানু কাত্যায়নী দেবীর নিকট কাত্যায়নীসদৃশ কন্যা কামনা করলে দেবী তাঁকে সেই ডিম্বদান করলেন। বৃকভানুপত্নী কীর্তিদা হাতে করে সেই ডিম্ব দেখছিলেন, সহসা তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে রক্তবিদ্যুল্লতার ন্যায় কৃষ্ণমোহিনী পদ্মিনী আবির্ভূতা হলেন। রক্তবিদ্যুতের প্রভাধারণ করেছেন বলে বৃকভানু তার নাম রাখলেন রাধা। এরপর ভাদ্রমাসে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল হতেই রাধা শক্তির উপাসক। তাঁর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে কাত্যায়নী বর দিয়ে বললেন, বিষ্ণুর সঙ্গে তোমার মিলন হবে। তোমার সঙ্গ ব্যতীত তিনি কোনও কার্য করতে পারবেন না। আর তোমার সঙ্গ লাভের ফলেই তাঁর কৈবল্য লাভ হবে।

দেবী পদ্মিনীকে বলেছিলেন, কালীয়দমন প্রভৃতি কৃষ্ণের যত কিছু কীর্তি সকলই কালিকার প্রসাদে। দৃশ্যাদৃশ্য যা কিছু, সকলই মহামায়ার স্বরূপ। শক্তি ব্যতীত এ জগতে কিছুরই অস্তিত্ব নেই। মহাবিদ্যার উপাসনা করলেই রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করা কর্তব্য। অন্যথা সে উপাসনা নিষ্ফল। রাধাতন্ত্র কৃষ্ণরাধার যুগল ভাবের সাধনা।

তন্ত্রে শক্তিজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান। শক্তি হলো ব্রহ্ম। কাজেই শক্তিসাধনা ব্রহ্মসাধনা। এ সাধনা অদ্বৈত ব্রহ্মসাধনা। সাধনার প্রথম অবস্থায় দ্বৈত থাকে, চরম অবস্থায় অদ্বৈত। নারদপঞ্চ রাত্রে বলা হয়েছে, ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে অতিক্রম করে রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন ব্রহ্মস্বরূপা নির্লিপ্তা দেবী। ইনি শ্রীরাধা। হরি যেমন নিত্য সত্য ইনিও তেমনি নিত্যা সত্যস্বরূপা। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী। রাধাকৃষ্ণের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। দুই-ই এক। রাধাকৃষ্ণের এই যুগলরূপ, এই যে এক হয়েও দুই এবং দুই হয়েও এক হওয়া। এইটি বৈষ্ণবের রাসলীলার চরমতত্ত্ব। রাধাকৃষ্ণের মিলনানন্দই বৈষ্ণবের চরম রসতত্ত্ব। প্রকৃতি স্বরূপতঃ রাধা আর পুরুষ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ। প্রকৃতি পুরুষের মিলনই ঝুলনযাত্রা।

নারদপঞ্চ রাত্রে বলা হয়েছে— কৃষ্ণের পরাকাষ্ঠা যিনি তিনি এক, তিনিই দুর্গা, তিনিই মহাবিষ্ণুস্বরূপিনি পরমাশক্তি। রাধা ও কৃষ্ণে ভেদ নেই। আবার দুর্গা ও রাধাতেও ভেদ নেই। উক্ত গ্রন্থেই দেখা যায় পার্বতী শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, বৃন্দাবন বনে রাসে আমি তোমার বুকে রাধা। সম্মোহন তন্ত্রেও দুর্গা ও রাধাকে এক বলা হয়েছে। যিনি নিত্যা পরা অন্তরা, তিনিই রাধা, তিনিই মহালক্ষ্মী, তিনিই ত্রিগুণাত্মিকা, তিনিই দুর্গা।

হলায়ুধ

চিরন্তন চক্রবর্তী

হলায়ুধ দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রকার। তিনি স্বকীয় গুণাবলীতে এবং সামাজিক মর্যাদায় অত্যন্ত উন্নত ছিলেন বলে সমাজ ও ধর্মরক্ষায় সুকঠিন দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁর অদম্য প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম সে সময় রক্ষা হয়েছিল। তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য এ ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহ দান করেছে। তিনি ছিলেন সর্বশাস্ত্রে বিশারদ এবং তাঁর জ্ঞান বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত ছিল।

হলায়ুধ ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ ধর্মীয় আচার ব্যবহারে অত্যন্ত প্রশংসার্হ ছিল। তাঁদের আর্থিক ঐশ্বর্য তো ছিলই, তা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় এবং ব্রাহ্মণ্য আচার ও রীতিনীতিতে ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁর পিতা ধনঞ্জয় ছিলেন বাৎস্যগোত্রীয় ধর্মাধ্যক্ষ। হলায়ুধের দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতি ও ঈশান শ্রাদ্ধ, আহ্নিক বিষয়ে দু'খানি মূল্যবান পদ্ধতি রচনা করেছেন। পশুপতি শ্রাদ্ধ পদ্ধতি ব্যতীত পাকযজ্ঞ সম্বন্ধে একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। হলায়ুধের গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' পণ্ডিত সমাজে অত্যন্ত সুপরিচিত। এছাড়াও তিনি রচনা করেছেন 'মীমাংসা সর্বস্ব', 'বৈষ্ণব সর্বস্ব', 'শৈবসর্বস্ব' ও 'পণ্ডিতসর্বস্ব'। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' ছাড়া অন্য কোনও গ্রন্থ আর পাওয়া যায় না। পাণ্ডিত্যের জন্য তখনকার বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণ সেনের নিকট হতে হলায়ুধ প্রভূত সম্মান ও আতিথেয়তা লাভ করেছেন। লক্ষ্মণ সেন তাঁকে যৌবনে মহামাত্য ও প্রৌঢ়বয়সে ধর্মাধিকার পদে নিযুক্ত করেন।

হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থের প্রারম্ভে এই গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা

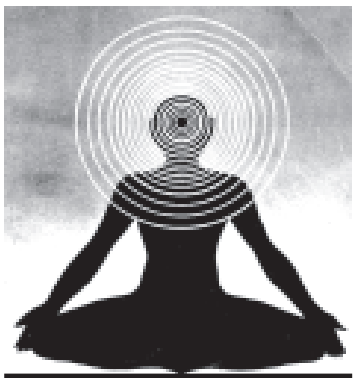

ভারতের শাশ্বত মনীষা

করেছেন। তিনি বলেছেন যে ব্রাহ্মণের সমস্ত বেদগ্রন্থ অর্থসহকারে অধ্যয়ন করা উচিত। বেদাধ্যয়ন ও বেদের অর্থজ্ঞান ব্যতীত গার্হস্থাশ্রমে কোনও ব্যক্তির অধিকার জন্মে না। হলায়ুধের মতে, বিশুদ্ধ ধর্ম অর্জনে প্রয়াসী ব্যক্তি বেদ অপেক্ষা অন্য কিছুই ইচ্ছা করেন না। ধর্মের উৎস পবিত্র, অন্য সবই মিশ্র।

দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বৈদিক পণ্ডিতরা সম্পূর্ণ ভাবে শাস্ত্রের প্রকৃত পথ হতে বিচ্যুত ছিলেন না। ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থের আলোচনার থেকে বোঝা যায় যে হলায়ুধের সময়ে দেশে বেদ অধ্যয়নের প্রচলন থাকলেও তার মধ্যে দোষ দেখা যায়। সে সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বেদচর্চা কমে গিয়েছিল। একাদশ শতাব্দীতে প্রবোধচন্দ্রোদয় গ্রন্থে কৃষ্ণ মিশ্র স্পষ্টই বলেছেন, উত্তর ও পশ্চিমপ্রদেশে অধিবাসীগণ বেদ পরিত্যাগ করেছেন।

দ্বাদশ শতাব্দী ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনও সময়ে হলায়ুধ এই ব্রাহ্মণ সর্বস্ব গ্রন্থ রচনা করেন। তখন দেশে পাল যুগ শেষ হয়ে সেনযুগ চলছে। পালরাজারা ছিলেন বৌদ্ধ কিন্তু সেন রাজগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের প্রভাবে হিন্দুধর্মের মধ্যে বিভ্রান্তি উপস্থিত হচ্ছে দেখে তিনি হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণসর্বস্ব রচনা করেন। এই রীতি অনুসরণ করলেই ধর্মের সমস্ত মূল উৎস অবগত হওয়া যাবে। তাঁর ধারণা ছিল বেদের মধ্যে হিন্দুধর্মের মূল দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাই বেদের অর্থবোধ হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেছেন।

ষোড়শ মহাজনপদ কোশল

গোপাল চক্রবর্তী

ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম কোশল। বর্তমান উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা অঞ্চল নিয়ে কোশল রাজ্য গঠিত ছিল। কোশল ছিল কাশীর প্রতিবেশী এক বৃহৎ রাজ্য। কোশলের ছিল উর্বরা ভূমি। অযোধ্যা, শ্রাবস্তী, সাকেত প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগর এই রাজ্যে অবস্থিত ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ ও প্রশ্নোপনিষদে কোশল দেশের উল্লেখ আছে। রামায়ণে কোশলের প্রসঙ্গ বহুবার এসেছে। কারণ কোশলের

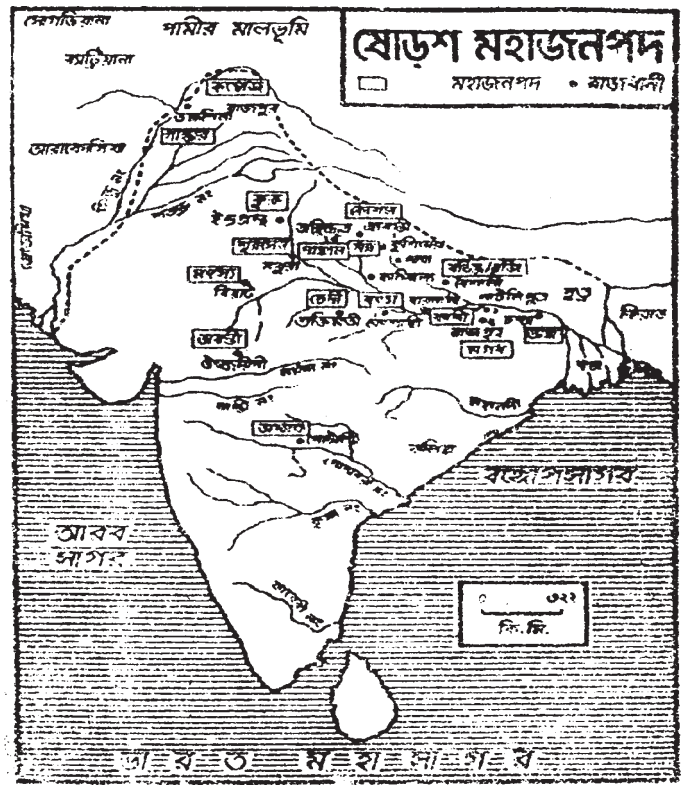

রাজধানী অযোধ্যায় দশরথ ও রামচন্দ্র রাজত্ব করতেন।

সরযূ নদীর উত্তর ও দক্ষিণাংশে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ কোশল অবস্থিত ছিল। যথাক্রমে শ্রাবস্তী ও কুশাবতী ছিল এদের রাজধানী। মহাভারতে বহুস্থলে কোশল প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। মহাভারতের সভাপর্বে দেখা যায় দিগ্বিজয়কালে ভীম উত্তর কোশল এবং সহদেব দক্ষিণ কোশল জয় করেছিলেন। শান্তি পর্বে উল্লেখ আছে মুনি কালকবৃক্ষীয়ের সঙ্গে কোশল রাজ ক্ষেমদর্শীর রাজধর্ম সম্বন্ধে কথোপকথন হয়েছিল। কর্ণ পর্বে দেখা যায় অভিমন্যু যুদ্ধকালে কোশল দেশের এক নৃপতিকে হত্যা করেন। কর্ণ দুর্যোধনের সমৃদ্ধির জন্য কোশল জয় করেছিল। আবার অশ্বমেধ পর্বে দেখা যায় যজ্ঞের জন্য অর্জুনও কোশল রাজ্য জয় করেছিলেন। স্কন্দপুরাণের উক্তি অনুসারে কোশল দেশে বহু গ্রাম ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থেও কোশল এবং এর রাজধানী সাকেত নগরীর বহু উল্লেখ আছে।

কোশলরাজ মহাকোশলও ছিলেন ইক্ষ্বাকু বংশীয়। রামায়ণ মহাভারতে ইক্ষ্বাকু বংশ 'মহান বংশ' বলে উল্লেখ আছে। মহাকোশলের পর তাঁর পুত্র প্রসেনজিৎ কোশলের সিংহাসনে বসেন। তিনি ভগবান বুদ্ধের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মগধরাজ বিম্বিসারের মহাকোশলের কন্যা কোশলদেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। এই বিবাহের যৌতুক হিসাবে মহাকোশল জামাতাকে কাশী নগরটি দান করেন। বিম্বিসার পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলে পুত্র অজাতশত্রু বিদ্রোহী হয়ে পিতাকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। ভগ্নীপতির নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কোশলরাজ প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে প্রথমে অজাতশত্রু জয়ী হলেও পরে এক অতর্কিত আক্রমণে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। শেষপর্যন্ত উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়। প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুর সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেন এবং যৌতুক স্বরূপ কাশীনগরটি আবার অজাতশত্রুকে ফিরিয়ে দেন। অজাতশত্রুও পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ছিলেন বুদ্ধের সমসাময়িক। বুদ্ধদেবের বেতবনে অবস্থানকালে তিনি নিয়মিত তাঁর উপদেশ শ্রবণ করতেন। তাঁর রাণী মল্লিকাও বুদ্ধদেবের পরম ভক্ত ছিলেন।

অঙ্গনা

নারী সুরক্ষায় র‍্যাগিং আইন

র‍্যাগিং র‍্যাগিং র‍্যাগিং— এখন এটা একটা চলতি কথা। আজ শুধু তাই নয়; রীতিমত চলতি রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের নানাভাবে পরীক্ষার মানসিক-শারীরিক ভাবে আঘাত করা হয়। একসময়ে যেটা ছিল নিছক মজা বা ঠাট্টাতামাশা, আজ তা একটা ভীতিপ্রদ ঘটনায় দাঁড়িয়েছে।

কোনও এক দৈনিক পত্রিকায় দেখলাম এক ছাত্রীর আতঙ্ক। আগামী বছর জয়েন্টে বসে ভাল ফল ক'রে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হবার সে চেষ্টা করছে। কিন্তু তার আতঙ্ক 'র‍্যাগিং' নিয়ে। সেই কারণে সুযোগ পেয়েও ফিরে আসতে হবে না তো তাকে! এ ধরনের ভীতির উদ্দেশ্যে অভয় দিতে আইনজীবী অরুণা মুখোপাধ্যায়-এর একটি প্রতিবেদন।

নারীর সুরক্ষায় আজ পর্যন্ত যে সব আইন বলবৎ আছে তার মধ্যে মেয়েদের উপর দৈহিক বা মানসিক নির্যাতনরোধে 'র‍্যাগিং আইন' বর্তমান সভ্যতার প্রগতিতে অন্যতম। এই আইন বলবৎ হয়েছে ২৪শে সেপ্টেম্বর ২০০৪ সালে। যদিও ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকলের উপরই র‍্যাগিং হয়, কিন্তু মেয়েদের উদ্দেশ্যে যে আইন, এই আইন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা এ প্রতিবেদনে। প্রথমেই জেনে রাখা উচিত র‍্যাগিং এর অর্থ কি! র‍্যাগিং এর অর্থ হলো কোনো কাজের মাধ্যমে কিংবা লিখিত বা উচ্চারিত কথায় কাউকে মানসিক বা শারীরিক আঘাত করা। কোনও নতুন ছাত্র বা ছাত্রীকে এমন কিছু করতে বাধ্য করা যা তার পক্ষে কোনওমতেই সম্ভব নয়। ক্ষমতা দেখাতে বা অন্যকে পীড়নের আনন্দ পেতে নতুন ছাত্রদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা।

আইনের ধারা হলো (২০০০) ৩.১ ধারা— শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং নিষিদ্ধ হয়েছে ও এই অপরাধের শাস্তিবিধান করা হয়েছে।

৩.২ ধারা—কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেউ র‍্যাগিংয়ে অংশগ্রহণ, কোনওভাবে সহায়তা বা কোনও ভাবে প্রচার করবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থ হলো— শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইমারত বা চত্বর, অথবা হল (Hall) অর্থাৎ ছাত্রদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত ছাত্রাবাস অথবা হোস্টেল অর্থাৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত নয়, কিন্তু সংশ্লিষ্ট সময়ে উপযুক্ত কোনও আইন মোতাবেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ছাত্রাবাস।

৪ ধারা— র‍্যাগিংয়ের শাস্তি— অনধিক দু'বছরের কারাদণ্ড (সশ্রম বা বিনাশ্রম) অথবা/ও সর্বাধিক ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

৫ ধারা— অপরাধী ছাত্রকে বরখাস্ত করা ও তার ভর্তি ও পুনরায় ভর্তির উপর নিষেধ। ৪নং ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধী ছাত্র যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে যেখান থেকে তাকে বরখাস্ত করা হবে ও সেখানে পুনরায় ভর্তি করা হবে না।

৬ ধারা— বহিষ্কার। কোনও ছাত্র যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান বা পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে অন্য কোনও ছাত্রের বিরুদ্ধে র‍্যাগিং-এর অভিযোগ জানায়, তখন তিনি উপরোক্ত বিধান লঙ্ঘন না করে এই অভিযোগের সত্য নির্ধারণের জন্য অবিলম্বে অনুসন্ধানের বন্দোবস্ত করবেন ও সেই অনুসন্ধানের ফলে যদি অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে অপরাধী ছাত্রকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করবেন।

এবার প্রশ্ন হলো, পুলিশ এই প্রসঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ না নিলে তাহলে উপায় কি হবে? এর উত্তরে জানাই পুলিশ অভিযোগ না নিলে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১৭ ধারায় পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায়। এ ছাড়া বেআইনিভাবে আটক রাখা, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজ করতে বাধ্য করা ইত্যাদির অভিযোগে সরাসরি আদালতে জানানো যায়।

বর্তমানে মেয়েদের সুরক্ষার জন্য আরো সব বিশেষ আইন হয়েছে ও বিল আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে পরে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছে আছে। তবে এই সব জনকল্যাণ মূলক আইনে মেয়েরাও নিশ্চিত সজাগ হবেন যে তাঁদের অধিকার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রতিও তাঁরা যত্নবান হবেন—কারণ Rights and duties are corelative terms. সুতরাং নারীর দ্বারা জনকল্যাণমূলক আইনগুলির অপব্যবহার ঘটবে না বলেও আমরা আশা করবো বর্তমানে নারী সভ্যতার প্রগতিতে।

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম।। ৬

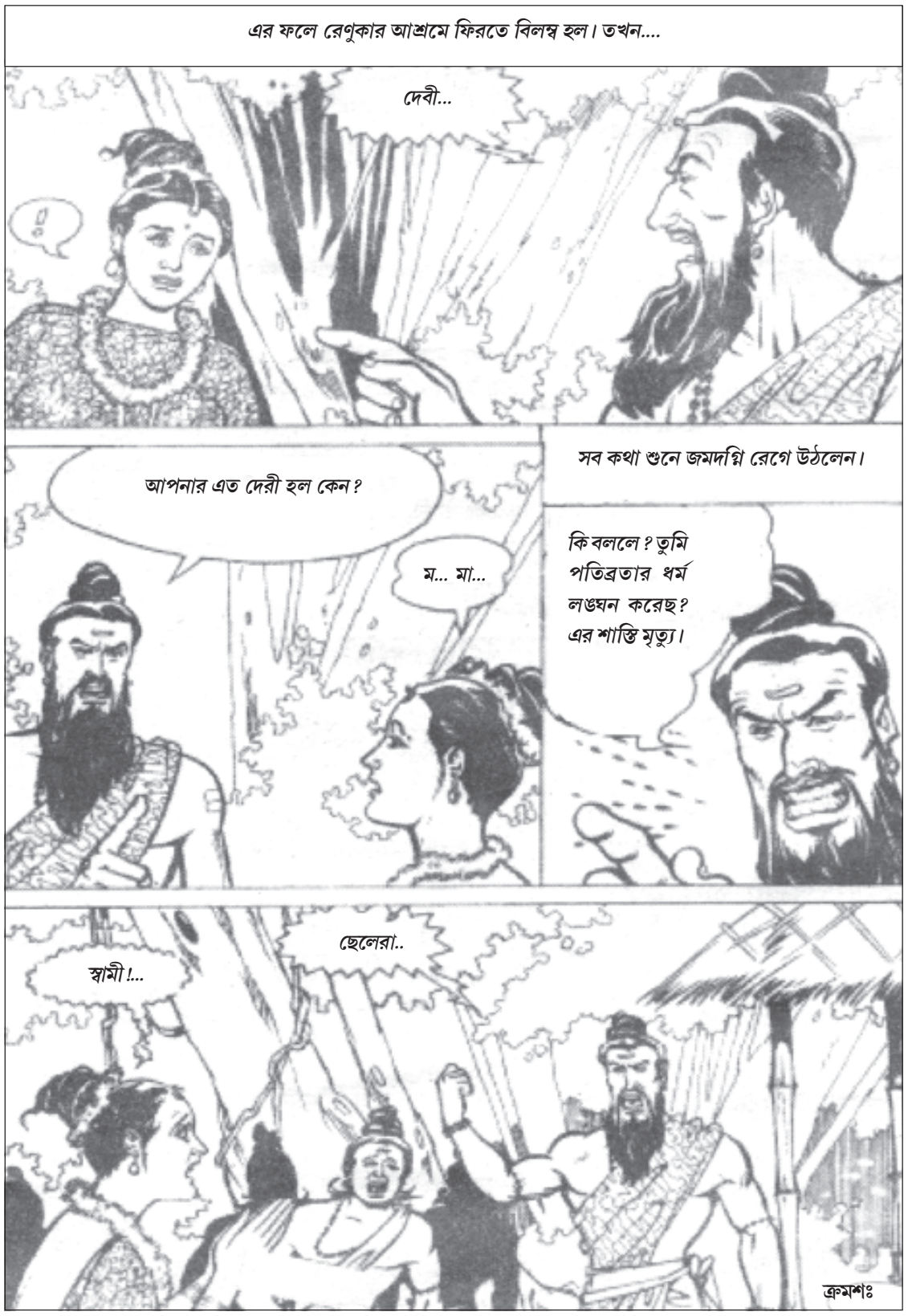

শ্রীরাম জন্মভূমিতে মন্দির ছাড়া অন্য কিছুই নয়

মুজফ্‌ফর হোসেন

১৯৯২-এ ৬ ডিসেম্বর বিতর্কিত বাবরি ধাঁচা বিধবস্ত হওয়ার পর যারা নিজেদেরকে বেশি বুদ্ধিমান ও শান্তির দূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তারা অনেকরকম প্রস্তাব দিয়েছেন। ওই সব প্রস্তাবের পিছনে কোনও বিশেষ যুক্তি ছিল না। তাদের মধ্যে একশ্রেণীর মত ছিল, ওখানে কোনও শিক্ষণকেন্দ্র তৈরি হোক, তাহলে মন্দির-মসজিদ বিতর্ক চিরতরে সমাপ্ত হবে। যাদের তথ্য-যুক্তির অভাব থাকে তারাই গোলমেলে মতামত দিয়ে থাকেন। এই শ্রেণীর কাছে হয়ত আদালতের উপর বিশ্বাসই নেই। অথবা ওদের দাবী-প্রস্তাব দুর্বল বলেই ঘোলাটে প্রস্তাব দিয়ে ঘোলাজলে মাছ ধরতে চান।

ওই সময়ে বিজেপি-র প্রথম সারির কয়েকজন নেতাকে বাবরি কাঠামো ধ্বংসের মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু আদালত ওই সকল নেতাদের সসম্মানে মুক্ত করে দেয়। আদালতের বক্তব্য, অভিযুক্তদের বিষয়ে যে সকল তথ্য প্রমাণ দাখিল করা হয়েছে তা থেকে তাদেরকে দোষী বলে সাব্যস্ত করা যায় না। অভিযোগকারীদের গূঢ় উদ্দেশ্য হলো যাতে অযোধ্যার ওই স্থানে শ্রীরামমন্দির তৈরি না হয়। এজন্য নানান যুক্তি-কুযুক্তি খাড়া করা হচ্ছে। সম্প্রতি একটি নতুন যুক্তি পেশ করা হয়েছে। সেখানে ইস্তাম্বুলের 'হোগিয়া সোফিয়া চার্চের' উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

হোগিয়া সোফিয়া চার্চ ঃ

সুতরাং আমাদের সবাইকে হোগিয়া সোফিয়া চার্চের ইতিহাস বিষয়ে অবহিত হতে হবে। ভূতপূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বাইজান্টাইন রাজবংশের সম্রাট জাস্টিনিয়ান ৫৩৭ খৃস্টাব্দে ওই চার্চ তৈরি করিয়েছিলেন। ওই সময়কালকে রোমান সাম্রাজ্যের সুবর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে। সেই সময়ে রোমান শাসকরা স্থাপত্য শিল্পকলার অদ্ভুত প্রয়োগে অনেক চার্চ তৈরি করেন। যেহেতু রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তার তুর্কিস্থানেও ছিল সেজন্য ওখানে অনেক চার্চ তৈরি হয়। হোগিয়া সোফিয়া চার্চ ওই সময়েই তৈরি হয়। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ওখানে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। মুসলিম শাসকরা তাদের স্বভাব অনুযায়ী বহুসংখ্যক মসজিদ স্থাপন করেন, এবং অনেক চার্চকেও মসজিদে রূপান্তরিত করেন। সে সময়েই ইস্তাম্বুলের মুসলমান শাসনকর্তার শকুনের দৃষ্টি সুরম্য সোফিয়া চার্চের উপরে পড়ে। তিনিই আদেশ দেন ওই চার্চকে মসজিদে পরিবর্তিত করার। চার্চের বাহ্যলক্ষণ বদল করে মসজিদে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। উঁচু মিনার তৈরি হয়। চার্চের যে বিশেষ স্থানে পাদ্রী বসতেন সেখানে বসেই সুলতান নমাজ পড়া শুরু করেন। চার্চের দেওয়ালে যেখানে যেখানে যীশু ও মা-মেরীর ছবি খোদিত ছিল তাকে খুঁড়ে ফেলে সেখানে কোরাণের আয়াত খোদাই করা হয়। এতকিছু করার পরও চার্চের লক্ষণ মুছে দেওয়া যায়নি। এখনও গম্বুজে মা মেরী এবং যীশুর ছবি দেখা যায়। কিন্তু সুলতান ও মুসলিম জনসাধারণ এতেই সন্তুষ্ট ছিল যে, তারা চার্চকে মসজিদে বদলে দিয়েছে।

ইসলামী প্রভুত্বের অবসান

হোগিয়া সোফিয়া চার্চের উপর মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল ১৪৫৩ সালে, আর তা বজায় ছিল ১৯৩৪ পর্যন্ত। কিন্তু ১৯২৩-এ এমন একটা সময় এল যখন কামাল আতাতুর্ক পাশার নেতৃত্বে তুরস্কে রীতিমতো বিপ্লব হয়। কামাল যাবতীয় প্রাচীন কালবাহ্য নিয়মনীতিকে রদবদল করে কামাল করে দেন। কামাল পাশা ইসলামকে কট্টরপন্থী কাঠমোল্লাদের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কামাল পাশার উত্তরণ শুধুই রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক বিপ্লবও ছিল। ইসলামের নামে চলা অনাচার-দুরাচারকে তিনি বিনষ্ট করেছিলেন। উনি ধর্মীয় রীতি-নীতিকে রাজনীতি থেকে পৃথক করেছিলেন। এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন যে, সুলতান এবং মোল্লা-মৌলবীদের পরস্পর এলাকা ভিন্ন ও নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

এরকম সময়ে তাঁর নজর হোগিয়া সোফিয়া চার্চের উপরও পড়ে। কামাল আতাতুর্কের চিন্তাধারা ছিল, যে সব ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের (ইসলাম বাদে) ধর্মস্থান জোর জবরদস্তি করে মুসলমান শাসকরা জবরদখল করে কবজা করেছেন— তা তাদেরকে ফেরৎ দিতে হবে। এই দৃষ্টিতে তিনি চেষ্টা করেন এবং মুসলিম কুকৃত্যকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেন। সার্বজনিকভাবে মুসলমান নবাবদের কুকৃত্যকে প্রকাশ্যে নিন্দা করেন। তিনিই ইস্তাম্বুলবাসী খৃস্টানদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন। পাদ্রীদের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করে চার্চ ফেরৎ দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু ততদিনে অনেক খৃস্টান মুসলিম শাসকদের অত্যাচারে তুরস্ক ছেড়ে পালিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠল— ফেরৎ নেবে কে? আবার চার্চ তৈরির কাজ কে শুরু করবে?

সে সময়ে কামাল পাশা তদানীন্তন পোপের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু কোনও খৃস্টান রাষ্ট্রপ্রধান বা ধর্মীয় নেতা সামনে আসেননি। অথবা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে চার্চের পবিত্রতা রক্ষা করতে পুনরায় চার্চ স্থাপনে এগিয়ে আসেননি। তখন কামাল পাশা ঘোষণা করেন যে, যদি খৃস্টানরা এই চার্চ ফেরৎ না নেন তবে সেটা তাদের সিদ্ধান্ত। রাজনৈতিক ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে যে চার্চকে মসজিদে পরিবর্তিত করা হয়েছিল তিনি তাকে মসজিদ বলে স্বীকৃতি দেবেন না।

প্রসিদ্ধ উর্দু কবি মহম্মদ ইকবাল তাঁর লেখা 'শিকবা ঔর জবাবে শিকবা' বইতে লিখেছেন, "হে আল্লা, তোমাকে খুশী করার জন্য আমরা কেন চার্চ ভাঙব? অন্য ধর্মের উপাসনাস্থল আমরা ভেঙেছি, অপবিত্র করেছি। তারপরও তুমি মুসলমানদের প্রতি প্রসন্ন নও কেন? (লেকিন এ পরারদিগার, তু ফির ভি মুসলমানো পঁর প্রসন্ন ন হুয়া?)" কিন্তু কামাল পাশা শুধুমাত্র কথার কথা বলার মতো মুসলিম শাসক ছিলেন না? ব্যতিক্রমী হিসেবেই তিনি অন্যদের জবরদখলীকৃত উপাসনাস্থল ফেরৎ দিয়েছেন। যদি কেউ ফেরৎ না নিয়েছে তাহলে সেই ধর্মস্থানকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সুরক্ষিত রেখেছেন। এখানে রুঢ় বাস্তব হলো— কামাল পাশাই সাচ্চা মুসলমান, ইকবাল নন। সেজন্যই কামাল পাশা অন্য ধর্মের ধর্মস্থানকে সম্মান জানিয়েছেন, সুরক্ষিত রেখেছেন। মুসলিমদের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। হোগিয়া সোফিয়া চার্চকে খৃস্টানরা পুনরায় গ্রহণ না করলেও কামাল পাশা মসজিদ হিসেবে যথাবৎ রাখেননি। একটি মিউজিয়ামে পরিবর্তিত করেছেন। কামাল পাশার এই সাহস ও সুবিচারের যতই প্রশংসা করা হোক তা কম হবে।

বুদ্ধিজীবীদের বাঁদরামো (ইতরতা)

ভারতের কিছু বুদ্ধিজীবীদের এবং রামমন্দির বিরোধীদের যখন হোগিয়া সোফিয়া চার্চের পুরো ইতিহাসটা নজরে এলো তখন তারা মুক্ত কণ্ঠে কামাল পাশার প্রশংসা করলেন। তারপরে কুটিল মনে বললেন ওখানে যা হয়েছে ভারতেও তার অনুসরণ করা উচিৎ। কামাল পাশা যেহেতু ওখানে মিউজিয়াম বানিয়েছেন, সেজন্য আমাদেরও ওখানে (অযোধ্যায়) মন্দির-মসজিদের বদলে মিউজিয়ামই বানানো উচিৎ। কতিপয় সেকুলার প্রজাতির কাছে উপরোক্ত প্রস্তাব বেশ গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। কিন্তু, এসবের আড়ালে কৌশল করে মূল বিষয়টি নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র দেখা যাচ্ছে। এখানে মূল প্রশ্ন শ্রীরামমন্দিরের নয়। শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরের। যা আরাধ্য দেবতার কোটি কোটি অনুগামীর কাছে পবিত্রস্থল বলে গৃহীত, স্বীকৃত। মন্দির অনেক হতেই পারে, কিন্তু জন্মস্থান একটাই। যে কেউ কল্পনা করতে পারেন, হোগিয়া সোফিয়া চার্চ যদি যীশুখৃস্টের জন্মস্থান হোত তাহলে কী খৃস্টানরা দখলদারি আদৌ ছাড়ত? কোনও খৃস্টান যীশুখৃস্টের জন্মস্থানকে মিউজিয়াম বানাতে রাজী হোত? কোনও মহাপুরুষের জন্মস্থানকে, কোনও ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতার জন্মস্থানকে না পাল্টানো যায়, না অন্যকে হস্তান্তর করা যায়। এজন্য তুরস্কের ওই চার্চের উদাহরণ শ্রীরামজন্মভূমির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নয়। যেভাবে কামাল আতাতুর্ক বলেছেন, চার্চকে জোরজবরদস্তি মসজিদ করে খৃস্টানদের প্রতি ঘোর অন্যায় করা হয়েছে। সেভাবে 'বাবরি মসজিদ' বলে হিন্দুদের আস্থা-বিশ্বাসের প্রতিও ঘোর অপমানজনক ব্যবহার হয়েছে—এটা কি বর্তমান সরকার স্বীকার করবেন?

অযোধ্যার রাজা দশরথ আর অযোধ্যা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি— এর কোনও ব্যত্যয় হতে পারে না। অন্য কোথাও শ্রীরামজন্মস্থান নেই।

হিন্দু রীতি-নীতি ও পরম্পরা অনুসারে যে যে স্থানে অবতার ও মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছেন সেখানে তাঁদের মন্দির স্মৃতিমন্দির ছাড়া কিছুই হতে পারে না। ওখানে যে আগে মন্দিরই ছিল তার অনেক অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আক্রমণকারীদের পক্ষে শ্রীরামমন্দির বিধবস্ত করাটা কোনও সমস্যাই ছিল না। ভারতবর্ষ জুড়ে অসংখ্য মন্দিরকে চূর্ণ করে মসজিদ বানানো হয়েছে। এটা কোনও গোপন কথা নয়। ধর্মস্থান ধ্বংসের এই সংস্কৃতিকে মুসলমান শায়র (কবি) এবং ঐতিহাসিকরা গোপন করেননি। ফলে একথা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট— শ্রীরামজন্মভূমিতে শ্রীরামমন্দির ছাড়া অন্য কোনও কিছুই হতে পারে না। যে সকল শুভাকাঙ্ক্ষীরা ইস্তাম্বুলের সোফিয়া চার্চের উদাহরণ দিচ্ছেন তাদেরও খোলাখুলি মন্দিরকে স্বীকার করে নেওয়া উচিৎ। যে স্থানের জন্য এদেশের হিন্দু সমাজ শতশত বৎসর সংঘর্ষ করে আসছে সেই রামজন্মভূমিতে মন্দিরই নির্মিত হওয়া উচিৎ।

হালিশহরে সংস্কৃত বর্গ

গত ২৯ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত হালিশহর নিগমানন্দ সারস্বত মঠে সংস্কৃত ভারতী'র উদ্যোগে সরল সংস্কৃত কথোপকথন শিক্ষক প্রশিক্ষণ বর্গ অনুষ্ঠিত হলো। পশ্চিমবঙ্গের ২৫টি স্থান থেকে ১০৩ জন এসেছিলেন। হালিশহর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বর্গ পরিদর্শন করে সন্তোষ ব্যক্ত করেন।

৭ আগস্ট বিকেলে বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারাসত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডঃ অয়ন ভট্টাচার্য। পৌরোহিত্য করেন স্বামী জ্ঞানানন্দ মহারাজ।

সংস্কৃতবর্গে শিক্ষার্থীরা।

একদিন সকালবেলায় শুভ্রবেশে প্রভাতফেরী এবং শিক্ষার্থীদের স্থানীয় তিনটি হাইস্কুলে সংস্কৃত বিষয়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকারিণী সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী, প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত এবং ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত বর্গ পরিদর্শন করেন।

সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতের জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছে।

এই বর্গে প্রশিক্ষণ নেন। একটি জেলা বাদে সব জেলারই প্রতিনিধিত্ব ছিল। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বেশির ভাগই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অধ্যাপক। অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্তরাও কয়েকজন ছিলেন। ২৯ জুলাই প্রদীপ জ্বালিয়ে বর্গের উদ্বোধন করেন ওই মঠের মঠাধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানানন্দ মহারাজ। বর্গাধিকারী ছিলেন কুচবিহার বি এন কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ ওঙ্কারনাথ পাঠক।

চেন্নাই থেকে আগত সংস্কৃত ভারতীর সর্বভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ নন্দকুমারজী, ডঃ পদ্মকুমার এবং ভগিনী নির্মলা প্রশিক্ষণ দেন। এছাড়া ওড়িশা থেকে চারজন শিক্ষক

আন্দামান-নিকোবরে হনুমত-শক্তি জাগরণ অনুষ্ঠান

গত ১৬ আগস্ট সারা দেশের সঙ্গে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের তিন জায়গায় সাড়ম্বরে পালিত হলো শ্রীহনুমত শক্তি জাগরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানগুলিতে শ্রীহনুমানের পূজা ও সমবেতভাবে হনুমান চালিশা পাঠ (১১ বার) করা হয়। পরে ভক্তজনকে প্রসাদ দেওয়া হয়। ওইদিন সকালে পাথরগাড্ডাতে অবস্থিত সরস্বতী শিশু মন্দিরে পূজানুষ্ঠান ও হনুমান চালিশা পাঠ করা হয়। শিশুমন্দিরের আচার্য-আচার্যা ও ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ওই অনুষ্ঠানে বিদ্যাভারতীর পূর্বক্ষেত্র সংগঠক বিজয় গণেশ কুলকার্ণী, আন্দামান-নিকোবর প্রান্তের সংযোজক গুপ্তেশ্বর থানাপতি ও শিশু মন্দিরের প্রধান আচার্য রঞ্জিত রাই উপস্থিত ছিলেন। ১৬ আগস্ট বিকেলে হনুমানজীর পুজোর মাধ্যমে পোর্টব্লেয়ার নগরের জংলীঘাটে অবস্থিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে শ্রীহনুমতশক্তি জাগরণের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী হরিপদানন্দ মহারাজ। সূর্যযোগী শ্রী উমাশঙ্করজীও উপস্থিত ছিলেন। হরিদ্বার কুম্ভমেলায় সন্ত-মহাত্মাদের নেওয়া প্রস্তাব পাঠ করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

শিলচরে অধিবক্তা পরিষদের আলোচনা সভা

অনুপ্রবেশ, জনবিন্যাস, রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জিকরণ এবং ডি-ভোটার সমস্যা নিয়ে শিলচরে গত ৮ আগস্ট এন আর ডি আই হলে জাতীয় স্তরের আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। আয়োজক ছিল অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের শিলচর শাখা। আলোচনা সভায় অধিবক্তা পরিষদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংগঠন সম্পাদক ও কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী জয়দীপ রায় বলেন, 'অনুপ্রবেশের শিকার শুধু অসমই নয়, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, গুজরাট ও রাজস্থানও, তাই অসমের ক্ষেত্রে কেন আলাদা আইন হবে? পরিষদের রাজ্য প্রধান নিশিতেন্দু চৌধুরীর বক্তব্য, 'শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী এক নয়। শরণার্থী হিসেবে এদেশে হিন্দুরা এসেছেন বাধ্য হয়ে। তাই তাদের নাগরিকত্ব দিতেই হবে। এ সব বিষয় রাষ্ট্রীয় নাগরিক আইনে আনতেই হবে। একই প্রসঙ্গে আসে 'ডি-ভোটারের কথাও। বক্তারা বলেন, অসমে প্রায় দেড় লক্ষ ভোটারকে 'ডি-ভোটার হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এদের ৭০ শতাংশই হিন্দু। এরা দেশভাগের বলি হয়েছেন। তারা ১৯৫০ সালের আইন অনুসারে এদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য। বিশিষ্ট সাংবাদিক অতীন দাশ, সাধারণ সম্পাদক শান্তনু নায়েক, নীহাররঞ্জন দাস, শঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। স্বাগত ভাষণ দেন আলোচনা সভার সভাপতি অখিলচন্দ্র দে। সেমিনারের সঞ্চালিকা ছিলেন সুস্মিতা পুরকায়স্থ।

সমাবেশ সমাচার

কার্যকরী সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী। অনুষ্ঠানে আর এস এসের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, আন্দামান বিভাগ প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, জেলা সঙ্ঘচালক ডঃ টি ভি আর এস শর্মাজী, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ডাঃ মৃণালকান্তি দেবনাথ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংরক্ষক কুমারী প্রীতম নন্দা, সচিব শম্ভুনাথ বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ওইদিনই এই উপলক্ষেই আরও একটি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় পোর্টব্লেয়ার থেকে ১৫০ কিমি দূরে মধ্য আন্দামানের বংগাতে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে।

হাওড়ায় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৫ আগস্ট হাওড়ার ক্যারি রোডস্থিত পদ্মপুকুরে নেতাজী মূর্তির পাদদেশে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে বিকেলে একটি সর্বদলীয় সভার আহ্বান করা হয়েছিল। সভার সভাপতি ছিলেন শিবশঙ্কর গুপ্ত, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন জয়দেব নাগ। হাওড়া জেলা বিজেপি-নেতৃত্বের উদ্যোগে এই কার্যক্রম আয়োজিত হয়।

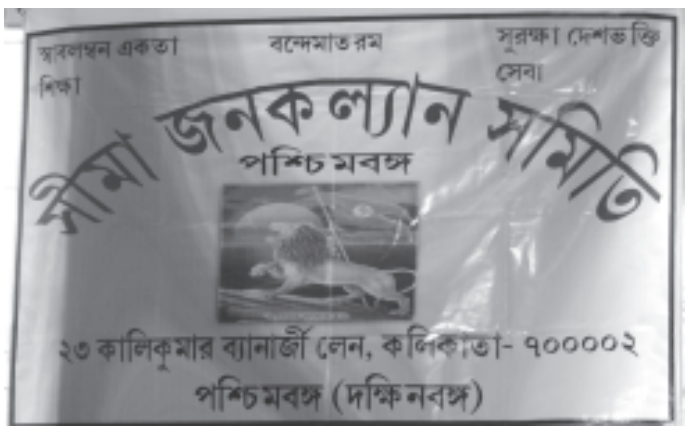

সীমা জনকল্যাণ সমিতির অধিবেশন

সীমান্তের সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করা এবং জাতীয়তাবোধের চেতনা জাগরণই সীমান্ত সমস্যার প্রাথমিক এবং নির্ভরযোগ্য পথ। এমনই মন্তব্য করলেন একযোগে শ্রীইন্দ্রেশ কুমারজী এবং রাকেশ শর্মা। গত ১৬ এবং ১৭ আগস্ট কলকাতার কেশব ভবনে অনুষ্ঠিত 'সীমা জনকল্যাণ সমিতির প্রাদেশিক অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে তারা এই মন্তব্য করেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা তথা সঙ্ঘের প্রচারক শ্রীইন্দ্রেশ কুমারের বক্তব্য অনুযায়ী সীমান্ত সমস্যার সমাধান দেশজুড়ে চলা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে অনেকটাই নিষ্ক্রিয় করবে। সঙ্ঘের প্রচারক তথা সীমা জনকল্যাণ সমিতির সর্বভারতীয় সংযোজক শ্রীরাকেশ শর্মার মতে, সীমা জনকল্যাণ সমিতির কাজের ফলে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা অনেকটাই নিরাপদ থাকবে। অধিবেশনে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণবাদ প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল প্রমুখ। সীমাজনকল্যাণ সমিতির কার্য সঞ্চালনের জন্য সমিতি গঠিত হয়। সমিতিতে দক্ষিণবঙ্গের সভাপতি হিসাবে বি এস এফের প্রাক্তন ডি আই জি দীপক চক্রবর্তী, সহ সভাপতি হিসাবে অধ্যাপক প্রলয় তলাপাত্র এবং সমাজসেবী সন্তোষ সরকার, সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন সেনা সন্তোষ শীল, কোষাধ্যক্ষ সোমক ব্যানার্জী, আইনী উপদেষ্টা রজত দাস, সদস্য হিসাবে জ্যোতির্ময় দেব এবং রঞ্জিতা চক্রবর্তী। দক্ষিণবঙ্গের সংযোজক সুভাষ নন্দী এবং উত্তরবঙ্গের সংযোজক হিসেবে মটুকেশ্বর পাল নিযুক্ত হয়েছেন। সমিতির উপদেষ্টা হিসাবে সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক অধ্যাপক অমল কুমার বসু এবং কেশব রাও দীক্ষিত রয়েছেন। বন্দেমাতরম-গীতের মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

শোক সংবাদ

গত ৯ আগস্ট সুন্দরবন জেলা সঙ্ঘচালক কর্ণধর মালির পিতা অতুলকৃষ্ণ মালি ৮০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৬ পুত্র, এক কন্যা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁর পুত্রগণ সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্বে রয়েছেন। প্রয়াত অতুলবাবু সঙ্ঘকাজের বিস্তারে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন।

* * *

ডাঃ নিত্যানন্দ হালদার গত ৩ আগস্ট ৬২ বছর বয়সে কলকাতার একটি বেসরকারী নার্সিং-হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি গত ১৯ জুলাই এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। ডাঃ হালদার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বলাগড় (হুগলি জেলা) প্রখণ্ডের সেবা প্রমুখ এবং আর এস এস সহ বিভিন্ন সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, তিন কন্যাসহ নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

গত ২৯ জুলাই ভোরে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানা সমিতির সভাপতি রাধাবিনোদ সুরাল পরলোক গমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন কল্যাণ আশ্রমের দায়িত্বে ছিলেন ও ব্যক্তিগত জীবনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক পদে কর্মরত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

গত ৩০ জুলাই অসমে উলফা উগ্রপন্থীদের সি আর পি এফের গাড়িতে বোমা-বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রাণ হারালেন মঙ্গল লায়েক। তিনি ছিলেন ঝাড়খণ্ডের রসিকনগর শাখার স্বয়ংসেবক। ২০০৬ সালে যোগ দেন সি আর পি এফের চাকরিতে। তার আগে কল্যাণ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

* * *

পশ্চিম কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা বড় খালিসামারীর নিবাসী ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের জেলা সহ-সভাপতি অনিল চন্দ্র বর্মন গত ২রা আগস্ট সকালে সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। স্ত্রী, চার পুত্র, দুই কন্যা সহ আট-নাতি-নাতনিকে রেখে গেলেন তিনি।

* * *

আর এস এসের ঘাটাল সহ-মহকুমা কার্যবাহ বিশ্বজিত ঘোষের মাতৃদেবী গত ১৪ আগস্ট পরলোক গমন করেন। বিশ্বজিৎ বাবুর দিদিমাও গত ১৮ আগস্ট সকালে প্রয়াত হন। বিশ্বজিৎ ঘোষ প্রায় সাত বছর সঙ্ঘের প্রচারক ছিলেন।

* * *

চলে গেলেন বর্ধমানের স্বয়ংসেবক মুরারী কংসবণিকের মাতৃ দেবী লাবণ্যবালা কংসবণিক। গত ১৮ আগস্ট রাতে তিনি স্বল্প রোগভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

মঙ্গল নিধি

আর এস এসের তারকেশ্বর জেলার মশাট খণ্ডের পাঁচুগোপাল ঘোষ তাঁর পুত্র হরিপাল মহকুমার শারীরিক প্রমুখ পলাশ ঘোষের বিবাহ উপলক্ষে ১০০০ টাকা মঙ্গলনিধি দান করেন। পলাশ ঘোষ চুঁচুড়া নগর ও ব্যান্ডেল খণ্ডে সঙ্ঘের প্রচারক ছিলেন।

কোরেল বিজ্ঞাপন

Swastika

30 August - 2010, Rs. 4.00 only

RNI No.5257/57

Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

Sri. B. S. Yeddyurappa

Hon'ble Chief Minister

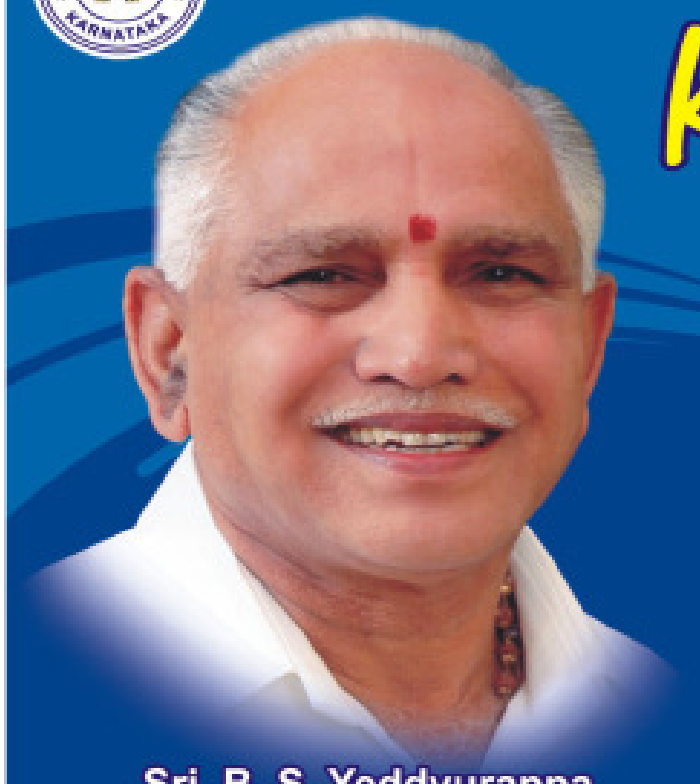

Karnataka

Forefront in Employment

Karnataka is the IT and manufacturing hub of India. Industry friendly policies, abundant skilled manpower and pro-investment environment assure the best ROI. Karnataka's ability to train and improve the unskilled workforce creates substantial opportunities. It pioneers among all Indian States in accelerating the privatization of skill development activity.

Not to emulate the benchmarks & standards of other countries, but to create our own benchmarks & model to suit India's conditions & meet global standards.

E-learning Lab

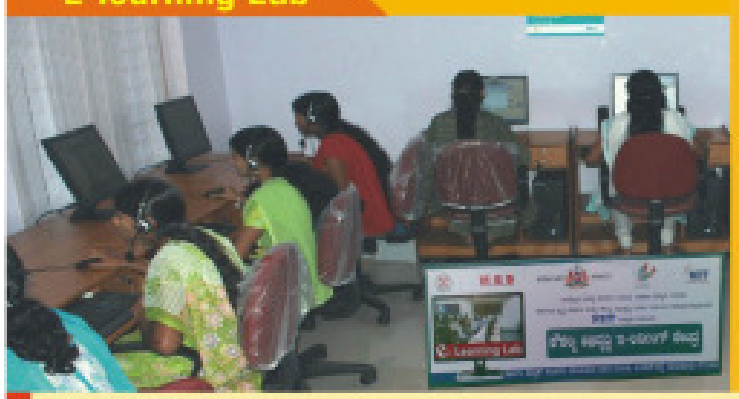

Skills Development and Udyog Melas	-	14
District level Mini Udyog Melas	-	138
Number of Industrialists who participated	-	1,830
Number of Job aspirants who attended	-	2,40,234
Jobs given through the Udyog Melas	-	55,346
Jobs given through Skills Development Programme	-	12,759
Jobs given through Employment Exchanges	-	9,597
Jobs given through stipendiary Scheme	-	41,450
Stipendiary Scheme	-	9,564

KVT SDC Initiatives

- Skill n Job fair - a platform for job providers & job seekers
- Training programme under MES (DGET)
- Skill Training for graduates under SAHAYOG scheme in association with Knowledge Commission & DCE
- Apparel training in association with RDPR
- E-learning lab in partnership with Social Welfare Department & NIIT
- Skill Development training in partnership with Engineering & Polytechnic colleges
- Training Program for Minority students in association with Department of Minority
- Establishment of HRD centres in employment exchanges to provide comprehensive service of assessment, counseling, Skill training & placement
- Skill mapping studies for ITI students in association with ICRA
- Koushalyasiri Helpline and Web portal hosted by KVTSDC with the help of Career Vision
- Central Placement Cell (CPC)

Development the Keyword of Administration

karnataka information

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ : সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স : ২২৪১-৫৯১৫,

e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com